বাংলা ওয়েবসাইট সৃষ্টিসন্ধান www.srishtisandhan.com বাংলা সাহিত্য ও শিল্প গ্রন্থনার একটি প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত এমনকি দেশের বাইরেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিয়মিত অথবা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় অগণীত বাংলা পত্রিকা। সুপরিচিত পত্রিকাগুলো ছাড়াও অনেক পত্রিকাতেই ধরা থাকে হয়ত বা অনেক ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে, দুর্মূল্য সাহিত্য উপাদান। অর্থ সমস্যা, প্রচার সমস্যা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে অনেক ক্ষেত্রে এরা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সময়ের সঙ্গে এরা হারিয়ে যায়, হয়ত কিছু লাইব্রেরীতে একটা সংখ্যা সংগৃহীত হয়ে থাকে অজ্ঞাতে।

সেখান থেকেই নির্বাচিত কিছু কবিতা নিয়ে এই সংকলন। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা ঠিক কিভাবে হয়ে উঠেছে চিরকালের কথা ও সমকালের দর্পন তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে এই সংকলনে। আর ইন্টারনেটের বেড়াজাল অতিক্রম করে এই দুর্মুল্য সাহিত্য ভাণ্ডারকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে আরও কিছু মানুষের কাছে।

সৃষ্টি সন্ধান

নাড়ুয়া বারোমন্দিরতলা, চন্দননগর, হুগলী ৭১২১৩৬
www.srishtisandhan.com

সেরা সৃষ্টি কবিতা সংকলন

সেরা সৃষ্টি

কবিতা সংকলন

সৃষ্টিসন্ধানের বিগত পাঁচ বছরের সংগ্রহ থেকে সংকলিত শতাধিক কবিতা

ভান্ডে ব্রহ্মান্ড দরশন ঃ সম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রবণতা

সাম্প্রতিক ছোট পত্রিকার সৃষ্টিসন্ধানীয় সংগ্রহে চোখ বোলাতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়ে একালের কবিতার কতগুলি বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতার ধারা বাংলা কাব্যেতিহাসে মহাকাব্যের যুগ পার হয়ে এসেছিল রোমান্টিক গীতিকাব্যের যুগ যার পূর্ণায়ত বিকাশ হয়রবীন্দ্রনাথের হাতে। বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র প্রমুখেরা এবং পরবর্তীকালে শঙ্খ, শক্তি, সুনীলদের হাতে রারীন্দ্রিক থিম ও ভঙ্গিমা সচেতনভাবে বর্জিত হলেও এঁদের কেও সেই রোমান্টিকতারই এক রকমফের বলা যেতে পারে, যদিও শেষোক্ত তিনজনের কাব্যে সেই আন্তলীন সুরমগ্ন গীতিকবিতার ঢংটি পাল্টাতে শুরু করেছিল, যা আমূল বিবর্তিত হয়ে গেছে এই শতকের কয়েক দশকের রচনায়। আমরালক্ষ্য করলে দেখব, কবিতার অন্তর্গত ধ্বনিমাধুর্য ও অন্তর্লীন সঙ্গীত মুছে কবিতা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি বিবৃতিমূলক, ইনফরমেটিভ। কবিতায় কবির প্রত্যক্ষ আবেগের তাপ অনেক কম, বরং খুব সংহত কণ্ঠে সে তাপ লুকিয়ে ফেলে যেন তিনি একটি নিরপেক্ষ বয়ানদেবার ভান করেন। তিনি ঠিক বেঠিক কিছু বলতে চাননা, রিপোর্টের ধরনে যেন জনসাধারনকে পরিবর্তমান জগতের বেশ কিছু চক্রান্তফাঁস করে দিতে চান। 'ভান' একারনেই কবির আক্ষেপ ও সহানুভূতির কাঁটাটি কোন দিকে - এ ধরনের বিবৃতিমূলক বয়ানের ভিতরেও তা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয়না।

এতো গেল প্রকাশভঙ্গির কথা। বিষয়বস্তুতেও কতগুলি প্রবণতা বা অভিমুখও আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়না। মহাকাব্য ও গীতিকাব্যর যুগে বিষয়বস্তুর বৈপরীত্য ছিল বহির্বিশ্ব ও অন্তর্বিশ্বের। গীতিকাব্য ধারার মূল ঝোঁকটা ছিল কবিদয়ের আত্মউন্মোচনে।স্রষ্টার নিজের দিকে এই ঝুঁকে থাকা চোখটি আজও তেমনভাবে সক্রিয়। সমকালীন, গীতিকবিতাও আত্মমুখী কিন্তু এই 'আমি'র পরিধিতে আজ বিশ্ব ঢুকে পড়েছে। তাই 'আমি'র বিবৃতিতেও ঢুকে পড়ছে ইরাক আক্রমন, ব্রিগেডের কূটনীতি, সম্পর্কের পন্যায়ন। তাই এ এক অভিনব সময়ের কাব্য যখন আত্মিক সংকটের বর্ণনায় বিশ্ব এসে ঢুকে পড়ে, তার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অনুকনাগুলি সেভাবেই বিশ্ব নাগরিকে প্রেক্ষিতে বর্ণিত হওয়ায় পেয়ে যায় মহাকাব্যিক গ্রাঞ্জার। এই বহির্বিশ্বের মধ্যে শহর --- গ্রামের সম্পর্কটি বেশ কৌতূহলজনকভাবে কবিতায় ধরা পড়েছে। গ্রাম যে সেই ছায়াঢাকা শান্তির নীড় নেই রাজনৈতিক অর্থনীতি তারও শিরায় প্রবেশ করানো হচ্ছে। বিপরীতে গ্রাম শহরের লোকবলের চাহিদাকে তুষ্ট করছে এই দ্বিমুখী সম্পর্কটিও কবিতায় ধরা পড়েছে। সুপ্রিয় ফনীর সড়ক কবিতায় দেখেছি সড়ক নামক উন্নয়নের সেতুর হাত ধরে গ্রাম ও শহরের যে আদান প্রদানের রূপরেখাটি তৈরি হচ্ছে তা মুলত উভয়ের ধান্দাবাজিরই প্রয়োজনে,

সড়ক জরুরী খুব, সরকার দীর্ঘজীবী হোক
সড়কের হাত ধরে ডানা মেলেছে পরম ঋসট
কাজের যোগান হবে ... কত কত এনটারটীন
গাঁয়ের চাহিদা আছে শহরে, কী ফ্রেশ আর গ্রীন।
সড়ক তৈরী আছে - উইক এন্ড... বৃহস্পতি যোগ
শহরে মিছিল আসছে, গ্রামে যাচ্ছে শুক্রবাহী রোগ।

এই নিরপেক্ষ বিবৃতিধর্মী বয়ানেরও যেন কবির সজাগ করে দিতে চাওয়া বিপদের সাবধানবানী এবং স্বার্থবাদী শক্তিদের চিনিয়ে দিতে চাওয়া সহানুভূতি চোখে পড়ে।

এই সময়ে সামাজিক ভাষ্যেও রাজনীতির প্রভাব লুকিয়ে থাকে, তাই সময়ের ভাষ্যে কবির সমকাল তার রাজনৈতিক সামাজিক, রূপবদল নিয়ে প্রকাশ পায়। এই সামগ্রিকতার বয়ান আধুনিক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রীজাতের কবিতায় এই মানুষ ও তার বৃহত্তর বৃত্ত বারবার প্রকাশিত হয়েছে তেমনই একটা কবিতা 'জীবন তোকে নিয়ে; এখানেও অস্থির সময় কীভাবে কবির অন্তর্জগতে ঢেকে তাও দেখি ---

''পা দিলে পড়ে যাব নির্ঘাত/ শ্যাওলা পোষে কত কার্ণিশ/ প্রেমের দিকটায় যাই না/ রাতের বাসে ল্যাং জার্নি/ যেদিকে ঈশ্বর থাকে না/ সেদিকে মুখ করে পেচ্ছাপ/ ফ্ল্যাটের ছোট ছোট জানালায় / আদর, প্রবলেম কেচ্ছা...''

এই কাব্যভঙ্গিতে উনিশ শতকীয় রোমান্টিসিজম সম্পূর্ণ ঝরে গিয়ে সময়ের সংকট এবং উপলব্ধ সত্য কোথাও কোনো রাখঢাক না কেড়ে কড়া রোদ্দুরেরর মতো জেগে থাকে।

'সড়ক' কবিতায় যে সংকট উন্মোচিত ও সমালোচিত তারই মুখ ধরা পড়ে শক্তি বসুর শেয়ার মার্কেট কবিতায়। ভোগসুখই যখনজীবনের সারকথা, পন্যায়নের দৌড়ে যখন আদর্শমূলক বানীগুলি উপহাসের বস্তু এখন কবি দেখান শস্যপাকার গন্ধে আমজনতার সামর্থ্য থাক বা থাক, লোভটুকু উপচে পড়ে। ''শস্য পেকেছে / কলকাতায় গন্ধ পাচ্ছি/ গুড় না থাক আছে তো কলসি / ফুর্তি করে নাও এই বেলা/ বার্ধক্যের জন্য আছে তো বারানসী'

সময় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রাষ্ট্রনীতি তথা রাজনীতির স্বার্থে, সময়-ই আজ নায়ক। একদিন, যুক্তিবাদের যুগে গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রয়োজন ফুরিয়েছিল, তাই শেক্সপীরিয় ট্র্যাজেডিতে নেমেসিসকে নেমে আসতে হলে মানবচরিত্রের দুর্বলতার ছুতো খুঁজতো হতো, সেই রন্ধ্র দিয়ে নেমেসিস প্রবেশ করে ট্র্যাজেজি বানিয়ে তুলত। কিন্তু আজকের যুগে মানুষ গুনাগার দেয় কোন পাপে, তা সে নিজেও জানে না, সে একটা অস্থির সময়ে বসবাসিত, যেখানে কোনো কারণ ছাড়াই তাকে ভুগতে হয়। খেসারত দিতে হয়। আজকে রাষ্ট্রশক্তি তথা রাজনৈতিক শক্তি সেই গ্রীক ট্র্যাজেডির নেমেসিসের মতো যা কার্য কারন ছাড়াই ঘনিয়ে আসে আমজনতার জীবনে, কে জানে কার পাপে বাজারে জিনিসের দাম বাড়ে, শিক্ষার মূল্য কমতে থাকে। লক্ষ টাকা দামে বিক্রি হয় বর্গফুট জমি, এমনকি গাছগাছালি, নদনদীর কাছে গিয়ে মানুষ একটু শুশ্রূষা খুঁজে নেবে, সেই 'প্রকৃতির মহাসান্ত্বনা' ও তাকে দাম দিয়ে কিনে নিতে হয়। ''না রে শাশ্বত, বেড়াতে যাওয়ার ওই কটা নোট জোগাড় হল না/ লিষ্ট থেকে নাম কেটে দেয় ঘুর্ণিচেয়ারে বসা অদৃষ্ট / আমরা চেয়েছি শ্রমের সুযোগ ... রাজা বা লিডারহতে চাই নে মা!/ (ভগবান তুমি ক্ষুধার অন্ন, ক্ষুধা মানে খিদে, হ্যাঁ হ্যাঁ হাংগার)/ পাঁচশো বছর অনশনত দীন বঙ্গজ পেটের হাঁকারে/ ঘূর্নিচেয়ার দুই হাতে ঘুরিয়ে কেটে ছিঁড়ে খাব অদৃশ্য হাত।'' এই ঘুর্নিচেয়ারে বসা অমোঘ 'অদৃষ্ট' আর দীন বঙ্গজের লড়াই আজ সরাসরি। আজ দুমুঠো দুধ ভাতের জীবনবীমা নিয়েকোনো অন্নদাত্রী দেবী নেই, তাই শেষ পংক্তিতে ব্যক্ত ভায়োলেন্স বুঝিয়ে দেয় শাশ্বত আম আদমিই এবার লড়ে নেবে তার প্রাপ্য।
এই স্বার্থচক্রে এবং রাষ্ট্রশক্তির থাবার তলায় থমথমে বিশ্ব, আর তৃতীয় দুনিয়ার বুভুক্ষু নাগরিকের জান্তব ক্ষুধা যেন আরো একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করে --- এ এক তন্ত্রের কাল -- মদে ভাসছে বাংলাদেশ পশ্চাচারী/ রাগী মানুষেরা দুমদাম মেরে দিচ্ছে মানুষ/ ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে উপচে পড়ছে অস্ত্রের ঢেউ/ ব্যবহার করো, বানিজ্য বাড়ন্ত, যন্ত্রে মেধার বিস্ফোরণ/ পরের ল্যাজে পা পড়লে তুলোপানা ঠেকে, নিজের ল্যাজে/ পা পড়লে বাপ বাপ বলে ... বাপ বাপ বলে ... বাপ বাপ দুটো আসছে খ্যাপা জানোয়ার রূপ ...'' লক্ষ্য করব কিভাবে বুশদাদা, ইরাক আগ্রাসন, পন্যায়ন, স্বার্থচক্র সবই ঢুকে পড়ে বাড়িয়ে তুলেছে সামাজিক কবির আত্মসংকট।

এসময়ের কবিতা আলোচনায় আমরা বলেছি বর্ণনাভঙ্গিতে যেন বাইরে থেকে ছিটিয়ে দেওয়া অভ্রগুঁড়োর মতো এক মহাকাব্যিক ঢং আয়ত্ত করা হয়েছে। আসলে আমাদের এই হাভাতে ছাপোষা মধ্যবিত্ত বেঁচে থাকার ভিতর যেভাবে ঢুকে পড়ে মাল্টিপ্লেক্স, ম্যাকডোনাল্ড, পিজা হাট তার ভারে দ্রুত ক্ষয়ে উবে যাওয়া মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনকে দেখার চেষ্টা করা হয় মহান দৃষ্টিভঙ্গির ভান এনে। কারন তাতে আর অন্তর্নির্হিত অসঙ্গতি আরো প্রকটিত হয়, শ্লেষ আরো ধারালো হয়ে ওঠে, 'জলেতে কুম্ভীর খায় / ডাঙাতলে বাঘ রায়/ বেওকুফ তুমি কোন দল?/ যাহাদের রঙ আছে/ বাঁচে বাঁচে তারা বাঁচে/ বাকি যারা কপাল সম্বল'' (ডুয়ার্সসীমান্তেঃ সেবন্তী ঘোষ) আজ হয়ত, নেমেসিস তথা নিয়তির প্রবেশপথ চরিত্রের নিরপেক্ষতা।
সময়ের এই ভরকেন্দ্রবিচ্যুতি সম্পর্কের ভিতরেও ঢুকে পড়ে। গভীর সম্পর্কেও আস্থাহীনতা কবিতায় প্রায়ই দেখা দেয়। কলকাতার এক ভাঙাচোরা রাস্তা 'হরি ঘোষ ষ্ট্রীট' বদলে যে জনজাল, কাদা, আবর্জনা উপচানো, দালাল, বুকি, অবিমৃষ্যবারী, ষড়যন্ত্রীদের অনুষঙ্গ মনে পড়ে, কবি তাকে প্রতিস্থাপিত করেন সম্পর্কের সংজ্ঞায়, ''সম্পর্কের ভিতরেই কোথাও না কোথাও ঠিক থেকে যাবে হরি ঘোষ ষ্ট্রিট/ আলো নেই, বাতাসও, অকিঞ্চ তন, সন্দেহভাজন পথচারী/ অলক্ষ্যে এখানেই গা ঢাকে দালাল, বুকি আর যারা অবিমৃষ্যকারী/ যাবতীয় ষড়যন্ত্র এখানেই সারা হয় যা কিছু অরাজনৈতিক'' (হরি ঘোষ ষ্ট্রীট/ প্রবাল কুমার বসু)
খুব নিবিড় সম্পর্কেও মানুষ আস্থাখুঁজে পায়না, সম্পর্কের এই বুনট মেয়েদের কবিতায় অনেক বেশি তীব্র। সম্পর্কে অনুগত থাকার সংস্কার মেয়েদের অনেক বেশি , অথচ ভরকেন্দ্র কোথায় যেন সরে গেছে। তাই অবিশ্বাস প্রকাশ্যে আসেনা, ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে ''ওকে মাড়িয়ে যাবার সাধ্যকী?/ পাশ কাটাব, রাশ টানব --/ ভাবি কিন্তু করা হয়ে ওঠে না/ প্রফুল্ল ঘাসজমির নিভৃতে/ সে শুয়ে থাকে'' (অবিশ্বাস ১/ পৌলোমী সেনগুপ্ত) একজন কথা দিয়েছিল সে, পাশে থাকবে একাবিংশ শতকের নারী গিরীন্দ্রমোহিনীদের মতো তা কৃতজ্ঞতচিত্তে স্মরণ না করে পরখ করে দেখতে চায় 'বলছ, ছেড়ে গেলে সঙ্ঘ থাকবেই/ ছেড়ে কি যাব তবে? বড় ডানা মেলে? তবু এত সহজে ছেড়ে যাওয়া যায়না সংসার বিশ্বাস ভালোবাসা --- ''কথার কথা সবই'' তাই -- পুরোনো শতাব্দীপ্রাচীন বিশ্বাসেই স্থিত থাকতে হয়, শুধু অবিশ্বাস হালকা একটা ঢেউ তুলে যায় অপারগতার ছোট্ট ধাক্কাটি প্রকাশমুখ খুঁজে নেয় অন্যভাবে

''হাওয়ারা সরে গেলে ডানার ধাক্কায়
''ছুড়ব এস এম এস তোমার নোকিয়ায়''
(অবিশ্বাস -২/ পৌলোমী সেনগুপ্ত)

প্রথম থেকেই এ আলোচনায় দেখা যাচ্ছে অস্থির সময়ের সংকট কীভাবে আধুনিক কাব্যের ভিতর ও বাহিরকে প্রভাবিত করেছে।প্রতিটি সময়েরই নিজস্ব প্রতিষেধক থাকে। সংকট উত্তীর্ণ হবার লড়াইই চেতনার কাজ, আর সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা এ লড়াইএ আয়ুধ করেছে সম্পর্ককেই। সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরে বেঁচে উঠতে চেয়েছেন কবি। সব্যসাচী দেবের শুশ্রূষা' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। আবার কবি কখনো ভরসা করেছেন সবচেয়ে তীব্র অস্ত্র কবিতারই। তা যেন ম্যাজিকের মতোই বদলে দেবে সবকিছু।

‘ম্যাজিক সকাল একদিন ভোরবেলা
শুরু হল সেই ডুকরে উঠল ছুরি
যেভাবে কাঁদলে মুছে যায় সব ব্যথা
আকাশে ওড়ালো স্বপ্ন দেখার ঘুড়ি

পৃথিবী জানল তরুণ কবির কথা
কীভাবে ফোটায় অন্ধপাতার চোখ
কুয়াশার ঘর ভরে গেল নীলতারা
(ম্যাজিক সকাল / বিশ্বজিৎ রায়)

আবার কখনো বা শিকড়ের টানে উৎসে ফিরে গিয়ে বুঝেছেন অন্ধগায়কের ভাটিযালী কীভাবে জুড়িয়ে দেয় ক্ষতমুখ। (অন্ধগায়কের ভাটিয়ালী / অমলেন্দু বিশ্বাস)

সবশেষে একথা বলা চলে সাম্প্রতিক কবিতামালা এক অদ্ভুত রূপ লাভ করেছে যেখানে সময়প্রবাহে পারম্পর্যে বহমান কবিতা ধারা গুলি যেন পরস্পরে মিলে যায়। গীতিকাব্যের অন্তর্মুখিনতা চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলেও লিরিকাল সুরের বদলে রয়েছে আপাত নিরপেক্ষ বিবৃতিমূল কন্ঠস্বর, মহাকাব্যের মতো বৃহত্তর প্রেক্ষিতে অভিপ্রেত বিষয়কে দেখা তাই অন্তর্জগতের বাস্তবতা পন্যায়ন ও বিশ্বায়নের যুগেপ্রতিমূহূর্তের বিশ্বে সংকট ও গতিপ্রকৃতিকে চিহ্নিত করেছে। মানুষ হয়ে উঠেছে ভুবনগ্রামের সদস্য, কবিও তার কাব্য নিয়ে বাদ যাননি সময়ের এই মুষ্ঠি থেকে।

সুদক্ষিণা বসু

ত্রিকোণ সংসার জুড়ে
অপলক জেগে থাকে
উদারীকরণের নবজাত শিশু,
মানুষের অনিঃশেষ বিত্ত - বাসনা!

অনিঃশেষ বিত্ত বাসনা
নৃপেন চক্রবর্তী

ইদানীং মানুষেরা বড় বেশী
দরজা জানলা বন্ধ করে রাখে।
বাইরের আকাশ দেখে
বন্দী ফ্রেমে টাঙানো ইজেলে।

এই তো সেদিনো ছিল
মানুষেরা অকপট উচ্চারণে
অনেকটাই খোলা মেলা ছিল।

অথচ ইদানীং অনেকেই
জ্যামিতিক চোখের জরিপে
সন্তর্পণে ঈর্ষা পুষে রেখে
বিপরীতে হেঁটে যায় উচ্চারণহীন!

সায়াহ্ন ছায়ার মত দীর্ঘ হয়
আকাঙ্খার উলঙ্গ মিনার!

ত্রিকোণ সংসার জুড়ে
অপলক জেগে থাকে
উদারীকরণের নবজাত শিশু,
মানুষের অনিঃশেষ বিত্ত - বাসনা!

শেয়ার মার্কেট
শক্তি বসু

শস্য পেকেছে
কলকাতায় গন্ধ পাচ্ছি
গুড় নেই যদিও ঘরে বেড়াচ্ছে মাছি
এ বেলা বলতো বেচে দিই
যত্নে রাখা সাদা হাতি।

শস্য পেকেছে
জওয়ানরা সব আগুয়ান
খবর শুনতে অফিসের বাবুরা বেলাবেলি বাড়ি যান
বৃষ্টি নেই, খটখটে শুকনো
যদিও তৈরী আছে সব জলযান।

শস্য পেকেছে
কলকাতায় গন্ধ পাচ্ছি
গুড় না থাক আছে তো কলসি
ফুর্তি করে নাও এই বেলা
বার্দ্ধক্যের জন্যে আছে তো বারাণসী।

ফ্রেন্ডলি ফায়ার
অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

বালক ঘুমিয়ে গেছে, তাকে কেউ ডাকেনি সন্ধ্যায়
মা বলে, ডেকো না কেউ , রাত্রিবেলা উঠে
যদি খেতে চায়,
তার চে' ঘুমিয়ে থাক, রাত্রির মতো চিন্তা নেই;

ক'মাস মাইনে নেই অবশেষে বন্ধ কারখানা
চালিয়েছে মা তার টুকিটাকি সোনাদানা বেচে
বাজারে বেড়েছে ধার, বাবা যায় চোলাইয়ের ঠেকে
বালক বোঝে না ঠিক , দীর্ঘদিন বাবা কেন কাজেই যায় না!

স্কুলে যাওয়া বন্ধ তার আজ বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে
বন্ধুরা স্কুলে যায় বালক তাকিয়ে থাকে , মা বুঝি বলেছে তাকে আজ
ও খোকা দেখিস যদি মাঠে কিছু শাক-পাতা পাস,
'ঠিকে ঝি' মা হবে শুনে তার মদ্যপ বাবা গালাগালি করে কিছুক্ষণ
পাশের বাড়িতে ফোটা ভাতের গন্ধে তার খিদে বাড়ে আর বাড়ে ক্রোধ
ঘুমিয়ে পড়ার আগে হুমকি দিয়েছে মাকে , রাত্তিরে ভাত না পেলে
আজ লঙ্কাকাণ্ড হবে মনে রেখো

চাঁদ ওঠে, রাত্রিবেলা ধীরে ধীরে বস্তির মাথায়
গলায় গামছার ফাঁস, সামনের বটগাছে বাবা তার ঝুলেছে লজ্জায়
যন্ত্রের বিষাক্ত তেল খেয়ে ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে মা,
তবে কিনা নতুন আর্থিক নীতি, ভর্তুকি দিয়ে আর চালানো যায় না কারখানা
কাজতো তৈরি হচ্ছে, তবে কিনা যন্ত্রের মতো দক্ষ , মানুষ যে হতে পারে না...

রাস্তার কুকুরদের গান
নবারুণ ভট্টাচার্য

শহরে যতই শপিং মল্
শহরে যতই ফ্লাইওভার
আমরা ততই কোণঠাসা আর
আমরা ততই হঠাবাহার

উঠে যাবে যত ছোট দোকান
উঠে যাবে যত চায়ের ঠেক
আমরা ততই হারাতে থাকব
নিভোনো উনুনে বাঁচানো সেঁক

চড়বে যতই হাইরাইজ
ততই কমবে তেজ রোদের
শীতে হি হি করে কাঁপব আমরা
আসবে না কিছু মসনদের

শহরে যতই গরিব কমবে
আমাদের খাওয়া জুটবে কম
বড়লোকদের শহরে আমরা
গোটা দুনিয়াতে একরকম

সাঁড়াশিতে ধরে চালান করবে
মৃত্যু শিবিরে-- পিঁজরাপোল
বিনা অপরাধে শুকিয়ে মরবো
জবাবে হবেনা হট্টগোল

শহর হাসবে মার্কারি দাঁতে
গিলে খাবে মদ, চিবোবে হাড়
আমরা তখন লুব্ধক হবো
আকাশ কুকুর -- তারার হার

সড়ক

সুপ্রিয় ফনী

সড়ক তৈরী হচ্ছে, গ্রাম থেকে শহরে এবার
মসৃণ পৌঁছে যাবে প্রসূতি ও মিছিলের লোক -
প্রযুক্তি আকাশ ছুঁলো, আমাদের জনসংযোগ
প্রভূত উন্নত হবে, সম্ভাবনা ই-পরিষেবার...

সড়ক জরুরী খুব, সরকার দীর্ঘজীবি হোক,
সড়কের হাত ধরে ডানা মেলেছে নরম ঋসট্
কাজের যোগান হবে... কত কত এনটারটীন্
গাঁয়ের চাহিদা আছে শহরে, কী ফ্রেশ আর গ্রীন !
তৈরী আছে, উইক এন্ড... বৃহস্পতি যোগ
শহরে মিছিল আসছে, গ্রামে যাচ্ছে শুক্রবাহী রোগ...

বনভোজন কেন্দ্র
অনির্বান দাশ

পৌরসভার হোর্ডিং 'বনভোজন কেন্দ্র' - কাছে দূরের
কিছু কিছু দল আসছেও এই শীতে পিকনিক করতে। আমরা
স্থানীয় লোকজন রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ব'সে কখনো কখনো
বিড়ি টানতে টানতেই জিগ্যেস করছি - ভাই, আপনারা
কি বাইরে থেকে এসেছেন? তারা বলছে হ্যাঁ, বেলঘরিয়া
থেকে ...

বাইরে থেকে আসো, ভিতর থেকে আসো, কাছ থেকে আসো,
দূর থেকে আসো - যেখান থেকেই আসো - এই
ফসল শূন্য ধু-ধু ক্ষেতে - কুয়াশা আর শুকিয়ে যাওয়া বিদ্যেধরীর
তীরে পিকনিক করতেই তো এসেছো, পিকনিক করতে
করতে জেনেও যাবে, এটাই আমাদের শ্মশান...

আরশী নগর
রফিক আলাম

বুকের মাঝ বরাবর পাঁচিল টেনে
একপাশে রাখি -
সাজানো গুছানো ঘর দালান
প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি, বিনোদন।

অন্যপাশে -
অনাবাদি জমি, মিলের বন্ধ চাকা
ভয়ঙ্কর ক্ষিধে, অনিশ্চয়তা
বেহদ্দ দিন গুজরান।

একেই বলে সংসদীয় গণতন্ত্রের সহাবস্থান

এত কোলাহল, যুদ্ধ, সন্ধিপ্রস্তাব
মনভোলা একাকি।
যারা সুদিনের সঙ্গী।
ছেড়ে গেছে আটটা চল্লিশের লোকাল।
লাইনে কারা।
ওরা শৈশব ছুঁয়ে রোজ বয়স্ক হয়ে ওঠে ।

অলৌকিক চাবিওয়ালা
দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়

বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে
অর্থনীতির সদর দপ্তরে তালা ঝুলছে
এবং চিন্তাজগতের লকগেট গুলিতেও তালা ঝুলছে,
অ্যাত তালা কারা আমদানি করেছে
তা সকলেই জানে
কিন্তু মুখে কেউ সেকথা বলতে পারছে না
সকলের জিভ এবং ঠোঁটের সঙ্গে
অদৃশ্য তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নানা আকারের এবং
নানা রঙের তালা -- সর্বত্র ঝুলছে,
এইসব তালাগুলির দিকে
করুণভাবে তাকিয়ে আছে কোটি কোটি মানুষ
যারা ভারতবর্ষের পথে পথে ঘুরছে
এবং খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই অলৌকিক চাবিওয়ালাকে
যে এখন আত্মগোপন করে রয়েছে।

ডিগ্রি

জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়

কত ডিগ্রি বামদিকে ঘুরে গেলে থার্ডডিগ্রি হবে?
এসব ফালতু কথা, চলো খাই রেশমি কাবাব
উতল মেলার মাঠে শুনি সেই মগ্ন কবিদের
যাদের অক্ষরবৃত্ত কোনও দাঙ্গা রুখতে পারেনি

বিষণ্ন জাহাজ ডাকে, অন্ধকারে, বন্দরের দিকে
ফ্লাইওভারের নীচে খেলা করে নিরন্ন বালক
এ বুড়ো শহর দেখো (পেচর্চা শিখেছে অনেক!
লালসার আলো জ্বলে, চোখ অন্ধ, অন্ধ হয়ে যায়

কোথায়, কোথায় সেই নবীন চৈত্রের দিন, হায়!

কত ডিগ্রি ডানদিকে সরে যাচ্ছি, অগোচরে, প্রিয়ে...

কল্পনায় ঘন অরণ্যের মরীচিকা দেখে
ওরা পাগলের মতো ওড়ে - এওর গা ফুঁড়ে
ছায়ার মতো চলে যায়

নির্জন এক সন্ধ্যায়
তুষার আচার্য

ইরাবতীর বুক থেকে উঠে আসা কিছু মানুষ
বলেছিল নদীর দু'ধারের কথা, সবুজ ফসল,
পাথর ঠুকে আগুন আর নৌকা ভাসানোর কথা
তারা আরো বলেছিল—
কী ভাবে সাঁতরে পার হওয়া যায় মিসিসিপি
কি ংবা ইয়াং সিকিয়াং
মাঝরাত হলে চাঁদ কীভাবে ডুব দেয় ভল্‌গায়
আর কী ভাবে নোনা ঘাম মিশে যেত বন্যায়
আমি তাদের বলেছিলাম কলমীলতার গল্প
ছোড়দির হাত ধরে স্কুলে যাওয়া আর
তোমার প্রথম শাড়ি পরে হোঁচট খাওয়া
তারা মজা পেয়েছিল
তাদের উচ্ছ্বাসে আরো বলেছিলাম
মেট্রোরেলের কথা, বাহান্ন চ্যানেলের টিভি
আর রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার কথা
বিমর্ষ হয়ে তারা নদীতে ডুব দিল
তারপর এক এক করে তুলে আনল
হাসেম চাচার ছুরিবিদ্ধ লাশ, পাদ্রীর পোড়াদেহ,
বন্‌ধ সমর্থন না-করা নিখোঁজ মুখার্জী জ্যেঠুর চশমা,

আমার হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে
শেষ বারের মত বলে গেল
তারা নাকি প্রতিটি ভোরেই জেগে উঠত ।

নিশিকান্ত নামা

শেখর চন্দ্র

রাত এখন দ্বিপ্রহর, তবু
নিশিকান্ত বাড়ি ফেরেনি, ফিরতে পারেনি
মানে ফেরা যায় না বলেই।
তার জন্য গরাদ ভাঙ্গা জানালায় মুখ ভাসিয়ে
শবরীর প্রতীক্ষায় নেই কোন উদ্বিগ্ন নারী
থানা পুলিশ হাসপাতাল মর্গে ছোটবার মতো বন্ধুবান্ধব
সে জোটাতে পারেনি কখনো একটাও।
আজ সকালে বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে
যে প্রৌঢ় আত্মহত্যা ক'রে
তিনি নিশিকান্ত নামে সনাক্ত হয়েছেন।
ধর্মতলার মোড়ে বাসচাপা পড়া লোকটারও
পরিচয় তাই।
মেদিনীপুরে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত মানুষ
অথবা বাঁকুড়ায় জমির বিবাদের জেরে খুন হওয়া
ব্যক্তির আদল বলে
এ আসলে ও-ই।
গুজরাট, কাশ্মীর, অসম কিংবা ইরাক, প্যাস্তোই, সোমালিয়া
মৃত্যুর মিছিলে শুধু একজন, একখানা দেহ
পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, পঁয়তাল্লিশ কেজি
চোখে চশমা ফুল লেন্সের।
কেন পৃথিবীতে এসেছিস, কেনই বা এভাবে যে যায়
কেউ জানে না, কারণ কেউ জানতেই চায় না।
দিল্লির 'অমরজ্যোতি' শহীদ মিনার
নিশিকান্তর জন্য নয়।
তবু নিশিকান্ত বেঁচে থাকে
ইতিহাসের আশ্চর্য আড়ালে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
ভুলে যাওয়া স্মৃতির পাতায়।
তবুও — এক অর্বাচীন কবি
তার সঙ্গে পথ হাঁটছে জীবনভর।

চন্দ্রকলা বিষয়ক অন্যগল্প

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে এমন সব অনন্ত জোৎস্নারা আছে
যাদের প্রতি মুহূর্ত অন্ধকারে কাটে

এ রকম কথার অনেক অর্থ -
শঙ্করাচার্য কেন কার্ল মার্কসও জানেন না
চাঁদের চন্দ্রকলা আসলে একটি নিয়ম,
আর এই নিয়মের পেটের ভেতর
চরকা-কাটা বুড়ি নয়
বৃহদাকার একটি চুম্বক রয়েছে ...

বিশ্বাস করুন, ধর্ষণ মুহূর্তেও কিন্তু
মেয়েটির তাই বিশ্বাস ছিল -
আকাশের ঐ চুম্বকটি আসলে একটি দেবতা ...

নতুন পাঠ্যক্রম
রতনতনু ঘাটী

বাঘের মেয়েকে আমি হিংসা পড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নতুন পাঠক্রমে
তাকে ভর্তি করতে চায় তার বাবা - মা।

হাতে - পায়ে তার এত বাঘনখ
দাঁতে তার টুঁটি কামড়ে ধরার আহ্লাদ
চোখে জঙ্গলের ব্যাকরণ।
আমি তাকে নতুন কী হিংসা পড়াব?

তবু তাকে হিংসা-কবিতা, হিংসা-অঙ্ক
হিংসা-ক্যুইজ ও হিংসা-ব্যাকরণ পড়াই।
দেখি, এ-সম্পর্কে তার জ্ঞান বড় কম।
বাঘের মেয়ে, এখনও ঠিকমতো হিংসা বানান লিখতে শেখেনি ?

আমি তার বাবা-মাকে ডেকে বলি -
আপনার মেয়ে এই হুঙ্কার শিখছে তো
এই ভুলে যাচ্ছে থাবার কৌশল,
এই দাঁতের তীক্ষ্নতা রপ্ত করছে তো
এই ভুলে যাচ্ছে হুঙ্কার।
ওকে এক বছর হিংসাপুরের হস্টেলে রেখে আসুন।

আজ এক বছর পরে দেখি -
দূর মাঠ ভেঙে বাঘ আসছে মেয়েকে নিয়ে
মানুষের কাছে হিংসা পড়াতে !

শিশুশিক্ষা
নীরেন্দ্র গুপ্ত

শিশু তো শেখেনি কিছু, বোঝে না মহিমা নাটকের,
দৃশ্য শেষ না হতেই হাততালি দিয়ে ওঠে হেসে।
জানে না সে সুখ - দুখঃ ভয়-দ্বেষ কখন কোথায়
কখন বাড়িতে ফিরে যেতে হবে যবনিকা শেষে।

নাটকে রাজাকে দেখে মুক্তকণ্ঠে দাদা ডেকে ওঠে,
পতিতাকে মা ডেকে দুহাত বাড়িয়ে দিতে চায়
অথচ রানীকে দেখে কি জানি কি ভেবে
দুচোখ ফিরিয়ে নেয়, বিরক্তির চিহ্ন ভ্রু - রেখায়।

যখন জহ্লাদ আসে, প্রাণদন্ড হবে প্রহ্লাদের
তখন হয়তো শিশু কি কৌতুকে হাসে খিলখিল,
অথছ নৃসিংহ যদি হিরণ্যকশিপু - বক্ষ ছিঁড়ে
পাপ দূর করে, শিশু কেঁদে ওঠে অতি মমতায়।

শিশু তো বোঝে না কিছু আমাদের দয়া প্রেম ঘৃণা
শত্রু-মিত্র কাকে বলে, কি প্রভেদ জয়ে - পরাজয়ে,
জানে না সে অভিনয়ে শেষ কোথা আরম্ভ কোথায়,
আমরা এসব তত্ত্ব শিশুকে শেখাবো ক্রমে ক্রমে।

অরফ্যান হোম
জয়ন্তজয়চট্টোপাধ্যায়

অরফ্যান হোম থেকে আমরাও দেখছি জীবন ---
একটি নেহাত শিশু মা - বাবার সঙ্গে হেঁটে যায়
টলমল করে হাতে তার হলুদ বেলুন
দিগন্তে মায়াবী আলো, কলরোল, আজ কার্নিভাল!
বাতাসে পিৎজার গন্ধ, চেটেপুটে চেখেছি সে ঘ্রাণ
আমরা বাজাই ফাটা এনামেল, প্রাণপণ, গান....

শহরের এক কোণে আমাদের দীনহীন চার্চ
পিয়ানোর নত সুর, সাদা মোম জ্বলে, ক্ষয়ে যায়
মেরিকে ডাকছি, মাগো, জন্ম দাও, আরও একবার

মা - বাবার হাসিমুখ, পিৎজা আর হলুদ বেলুন!

বিগত পাখি
মনীন্দ্র গুপ্ত

এদিকে অনেক গাছ ছিল,
বাড়ির পর বাড়ি ওঠার ফলে কাটা পড়েছে।
ছাদনাতলার মতো পাখিদেরও
গাছতলা না হলে বিয়ে হয় না।

এবার বসন্ত এল
আর ছেলে মেয়ে পাখিগুলো
অবিবাহিত থেকে পাগলা হয়ে গেল।
কল্পনায় ঘন অরণ্যের মরীচিকা দেখে
ওরা পাগলের মতো ওড়ে - এ ওর গা ফুঁড়ে
ছায়ার মতো চলে যায়।

পাখিহীন পৃথিবীর রঙিন বোরিআলিসের ওপারে
হিম সাদা চাঁদ আর তপ্ত কমলা রঙের সূর্য
আদি ডিমের স্মৃতির মতো উদয় হয় আর অস্ত যায়।

বশীকরণ

অরূপ চন্দ্র

লোকটির আসল ব্যবসা ছাতা সারানো নয়
হারিয়ে - যাওয়া চাবি তৈরী করেও
পেট চলেনা ওর -
চোরদের জুলুম লেগেই থাকে
সবখোল চাবির বায়নাক্কায়
অশান্তি আর বিরক্তিতে সূর্য ডোবে।

তার জামাটা অতি বৃদ্ধের রঙ চটা
ছাতার মত বিবর্ণ, তালিমারা
ঝোড়ো হাওয়ায় ছিন্ন ভিন্ন গাছ
বিধবস্ত কুটির ও কিশোরী -

লোকটির আসল ব্যবসা ছাতা সারানো নয়
চাবি তৈরীও নয় -
ওর পেশা আসলে ওষুধ বিক্রি
তাবিজ ও তরজা গাওয়া -
বশীকরণ ওষুধ ঃ স্বামী বশ হবে
স্ত্রী বশ হবে
লোকটা হাসে -
এই ওষুধ দিয়েছিল একদিন রাজা ও রাণীকে
তবু রাণী চক্রান্ত করে মন্ত্রীর সাথে
আবেশে বিবশ গণতন্ত্রী
বিরোধীরা উচ্ছিষ্ট চাটে
লোকটা হাসে ---

গেঞ্জি পর রাজা
গৌতম মুখোপাধ্যায়

এসো, অভিনয় শেষ হয়ে গেছে
খুলে রাখো নকল উষ্ণীষ।
ঝল্‌মলে কিংখাব আর রাজপোষাকের প্রহর শেষ।
ছেঁড়া গেঞ্জির উপর পলেস্টারের শার্টটা চাপাও
আর দাঁতে বিড়ি চেপে ঘষে তুলে ফেল গালের রঙ;
তুমি নাকি রাজা সেজেছিলে!

এসো, বিষাদ আর হত্যার আরশিনগরে নিজেকে দেখ—
ঠিক যেমন পাঁঠার মুন্ডু অবসন্ন চোখে দেখে
নিজের ঝুলন্ত ধড় আর কসাইয়ের ছুরি।
রাস্তায় ক্রুদ্ধ সৈনিক আর মাতালের তাড়া খেয়ে
শহরের বাইরে শুয়োরের বাচ্চারা
দল বেঁধে খোঁজে জমাট রক্তের ডেলা আবর্জনার স্তূপে
আর ভিখারি মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শিশু রাজপুত্র
চাটে রাষ্ট্রব্যবস্থার ঘাম!

এসো অভিনয় শেষ হয়ে গেছে
এখন কৌণিক দৃষ্টিতে পরস্পরকে মাপি,
রক্ত, হারেম, ঘাম আর সূক্ষ্ম ভণিতার চারপেয়েতে বসে
তুমি নাকি রাজা সেজেছিলে!

হা - হা মুখোস
তপন চক্রবর্তী

মুখোশ সবারই থাকে
কেউ নেই মুখোশবিহীন,
প্রয়োজনে কেউ পরে
কেউ পরে থাকে সারাদিন।

গোপনে কেউ বা পরে
কেউ পরে সকালবেলায়,
কেউ বা রাত্রে পরে
মেতে ওঠে হিংস্র খেলায়।

দেবতা মুখোস পরে
ছাড়ানো বসন যে সময়,
সমাজে তখন থেকে
মুখোশে মুখোশ বিনিময়।

মুখোশ পালটে যায়
কর্মকেন্দ্র করে রোজ,
মুখোশ টানতে গেলে
উঠে যাবে তোমারই দু চোখ।

বাঘছাল তোমার পোষাক
কাজল সেন

বাঘছাল পরে তুমি দিনে রাতে সেজে আছো বাঘ
নিজের পোষাক তুমি পরনি যে কতদিন
ব্যক্তিগত মেজাজী পোষাক
নতুন বছরে কেনা চুড়িদার পাঞ্জাবী
অথবা পুজোয় পাওয়া টেরিকট হাফশার্ট
স্টোনওয়াশ জীনসের প্যান্ট

কমলালেবুর ক্ষেতে সেই যে সেবার সারারাত
আগুন জ্বালিয়ে আমরা যুবক যুবতী সব
সারা দেহে মেখে উত্তাপ
তুমি শুধু ডোরাকাটা বাঘছাল পরে উজ্জ্বল
এক দুই দিন চার রমণীয় মুদ্রায়
নেচেছিলে প্রিয় বাঘনাচ

নিজের পোষাক তুমি পরনি যে কতদিন
বাঘছাল তোমার পোষাক
বাঘও রমণপ্রিয় বোঝে প্রেম ছলাকলা
থাবায় দেখেছে তার মুখ নির্ঘাৎ

অবশেষে বেলা যায় পশ্চিমের ঘাটে
নিভে আসে নিরুত্তাপ রোদ্দুরের রঙ

বিভাবন

অশোক চট্টপাধ্যায়

অবশেষে বেলা যায় পশ্চিমের ঘাটে
নিভে আসে নিরুত্তাপ রোদ্দুরের রঙ
নীড়ে ফেরা পাখিদের চপল ডানায়
চোখের কাজল রেখে অন্ধকার নামে

তারারা নিপুণ হাতে রাত্রি সাজায়
আলোকবর্ষ দূরে আলোর আকাশে
নীচে গাঢ় অন্ধকারে ক্লেদাক্ত সময়
কাদামাটি লেপে লেপে প্রতিমা বানায়

অনাহারে লক্ষ্মী কাঁদে নরনারায়ণ
আত্মহত্যা পাপ নয় উপদেশ দেয়
শ্মশানে আগুন দেখে নাচে কীর্তনীয়া
গান গায় বাঙলার নবজাগরণ...

আই.পি.এস. কোয়ার্টার
অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

প্রশান্ত আই.পি.এস কোয়ার্টার, তিরতিরে ছায়ায়
আরম্ভ ও শেষ, শয়নকামরায় ফিদা হুসেনের সরস্বতী,
তার পাশে মুখ্যমন্ত্রী, রাজগীরের গুরু,
র‍্যাকে কুমারসম্ভব, মার্কেস, সাঈদের ওরিয়েন্টালিজম।

দম্পতির একমাত্র মেয়ে, মামন, মহাদেবী বিড়লায়,
ঈষৎ বাদামি চোখে কালো তিল, হাতে সেলফোন।
আইপিএসদের ছেলেরা তুখোড়, কেউ রুরকিতে, কেউ অন্যত্র,
স্টেটস-এ চলে যাবে, নেকস্ট্ ডোরে উড়িষ্যা ক্যাডার।

এমন যে জীবন, জমকালো কোয়ার্টার, সেখানেও
আইপিএসরা টেনশানে থাকেন, কারণ
প্রায়ই জঙ্গলে, জাহানাবাদে যে মানুষ খুন করেন
সেই দুঃসাহসী মরা মুখ
কেবলই ঘুরে বেড়ায় পোর্টিকোয়, হাসে, সুতরাং
ক্লাবে নেশা - করা বেড়ে যায়, আর ওঁরা
দিনে দিনে অদ্ভুত ভয়ংকর বদলে যান
এদেশে ... চিলিতে ... মাইনামারে ...

কবি সন্মেলনের ঘোষণা
সৌমিত্র বসু

মাননীয় কবিবৃন্দ, আমাদের সময় সংক্ষেপ
মঞ্চে অনেকে আছেন, এসে পড়েছেন, এখনো আসছেন
রঙ্গালয় পূর্ণ আজ, পাথরের অনেক ভেতরে
ট্রেন গেলে যেরকম গুমগুম শব্দ শোনা যায়।
তেমনই গুঞ্জনধবনি স্থির হয়ে কেঁপে যাচ্ছে, শুনছেন নিশ্চয়।

মাননীয় কবিবৃন্দ প্রত্যেককে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হবে।
কম হলে ভাল হয়। তবে বেশি এক আধলা নয়,
দয়া করে পকেট থেকে কবিতাটি বার করে হাতে রাখুন,
ভাঁজ খুলুন কাগজের, চশমা চোখে দিন। কাশি শ্লেষ্মা,
গলাটলা ঝাড়া আগেই সারবেন। মাইক সামনে নিয়ে
অনর্থক ভ্যানতাড়া লোকে পছন্দ করে না।

মাননীয় কবিবৃন্দ, নাম ডাকতে শুনলেই ছুটে যান।
মাইকের তার পায়ে বেধে গেছে? পরোয়া করবেন না -
ওই দেখুন লোকে হাসতে হাসতে তাকিয়ে আছেন আপনার দিকে।
ওই দেখুন লোকে বলাবলি করছে আপনার টাক আর
প্যান্ট আর গায়ের রঙ নিয়ে। আপনার ঘষা গলা নিয়ে,
আপনার মুখ থেকে থুথু ছিটোল তাই নিয়ে।
আপনার ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ানো নিয়ে।

আপনাকে নিয়ে - আপনাকে নিয়ে কথা বলছে ওরা -
চিয়ারিও মাননীয়, কবিতা পড়ে যান। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিট
মনে থাকে যেন।

হলদে বায়োডাটা
গৌতম মুখোপাধ্যায়

সুচেতনা, তোমাকে দিলাম
আমার বায়োডাটার একটা কপি।
পুলিনের চায়ের দোকানে কেটলিতে জল ফোটে
পাঞ্জাবী গায়ে বাঁশের বেঞ্চিতে
আমি বসে থাকি, সস্তা সিগারেট ঠোঁটে,
সিগারেট ফোটে, আমার চিন্তায়।
ইচ্ছে করে লক্ষ্মী-পেঁচাকে কষে লাথি মারি;
হলুদ ঝোলে পাউরুটি চুবিয়ে খাই।
হলুদ বৃত্ত আমার চোখের চারপাশে
বটতলার হলুদ মলাটের বই-এর মত।
আঙুল চালিয়ে মাথার চুল ঠিক রাখি,
বিকালের ফ্যাকাসে হলুদ এখনও মরেনি।
পুলিন কয়লা চাপায় চায়ের উনোনেতে
বাঁশের বেঞ্চিটা নড়বড়ে
সারা মাসে সতেরো টাকার চা খেয়েছি ধারে।
রাজহাঁসের গলা টিপে ধরি,
খিস্তি দিয়ে বলি, যা পারিস করে নে।
সুচেতনা, তোমাকে দিলাম
আমার বায়োডাটার একটা কপি
এম-এ পাশ, বয়স সাতাশ
পুলিনের চায়ের দোকানে খুঁজো।।

আকাশের আঙিনায় পেসমেকার
আলিফ নবী ওমর

মরার আগে একবার শব হয়েছি
একবার
সব গ্লানি দুঃখ যন্ত্রণা বৈভব অনক্ষর
যমজ হৃদয়ের উপমেরু এখন উন্মুক্ত কারাগার।

একদিন সুস্মিত করতালির শেষে
যে যার বাড়িতে ফিরে গেল
দীর্ঘশ্বাসের রোমগুলি দিঙ্‌মূঢ়
জলাতঙ্ক রোগের ছন্দবদ্ধ মহড়া প্রতিনিয়ত।

এখন রোবটের মত তন্দ্রাবেশে কথা বলি
কৃত্রিম হাসি অপ্রতুল বাটিতে খাই
রঙিন মাটির জিষ্ণুবৃন্তে পদাচরণ
সার্কিট হাউসের সুবিন্যস্ত বধ্যভূমিতে নিদ্রা যাই।

মধ্যাহ্নের ভ্রূণ থেকে সূর্য তপ্তকাঞ্চন ঝরায়
দীর্ঘদেহী তালবীথির স্বরলিপি অগ্নিদগ্ধ
গোধূলির পর শর্বরীর অনিবার্য আগমন
দিগন্তজোড়া আকাশের আঙিনায় পেসমেকার

ঘর

ব্রত চক্রবর্তী

যারা এক সময় আমাকে তাদের
বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখত,
এখন তারা তাদের
ভেতরের ঘরে ডাকে।
আমার যাওয়া হয় না।

ঝড় বাদলে ছুটে গিয়ে
বরাবর আশ্রয় পেয়েছি যাদের ঘরে,
এখন আমি তাদের
বাইরের ঘরে টুকি দিয়ে চলে আসি।
আমার সময় হয় না।

দরজা খুলে আজ যখন
আমার কালকের ঘরে ঢুকতে যাই,
দেখি গতকালের ঘর
তার আগের দিনগুলোর
ঘরের ভেতর হারিয়ে গেছে।
আমার খোঁজা হয় না।

ফেংশুই
অমিত কাশ্যপ

পশ্চিমে বৈঠকখানায় হাওয়াঘন্টা দুলছে
প্রবেশদ্বারের সম্মুখে হাস্যোজ্জ্বল বৌদ্ধ মূর্তি
দরজার পাশে শুভ চীনা মুদ্রা
কোথায় রাখবো স্মৃতিচিহ্ন
কোথায় রাখবো তোমার বসার আসন
কোথায় রাখবো শরীরী শাসন
নতজানু, হৃদয়মন্দির শূন্য আজ

পরস্পরা
নন্দিতা বন্দোপাধ্যায়

আমাদের পুরোনো বাড়ি সেজেছে পর্দায়, নতুন রঙে।
জোড়াখাটে বাহারি চাদর ঘুমের আদলে। ঐ ঘরে পুতুল বিয়ে হতো।
যুবতী মা ঘরের জল কাচাতো বর্ষা ঋতু জেগে । দরজার টকটক,
ফিরে আসা বাবার ইসারা। হাতে রুগ্ন থলি। হা অন্ন হা অন্ন।

প্রতিবেশী অন্নপূর্ণা হয়ে রেখে যেতো বিশ্বাসী হাত, ঘর
জুড়ে, ঘর আলো হ্যারিকেন সাহস জোগাতো মানুষ
হবো, মানুষ হবো। চোখের তীরে বাবা-মা-র সুখ হাসি মুখ
জেগে উঠতো।

এখন দু-বেলা গ্যাস অন্ন রাধে। আপদহীন জেনারেটার ঘর।
অতিথির সুবেশী অহংকার। পাঁজরা কাঁপে ধিকি ধিকি। মানুষ হওয়ার
মন্ত্র ভুলে গেছি। পুরোনো পেলমেট দেয়াল প্রশ্বাসহীন, আদিতম
গুহার ভিতর দানবের জলছবি আঁকে । অট্টহাসি মাপে । মানুষ হইনি
কেউ, মানুষ হয় না কেউ। অসহায় পিতা মাতা অযাচিত
পাণ্ডুলিপি সযত্নে তুলে রাখে আজও, মনের ভিতর।

স্বপ্ন
অসিম সরকার

গত রাত্রে অনেকদিন পর, মাকে দেখলুম।
যেমন বছর ষাটেক আগে দেখেছি ঃ সাদা খোলের
শান্তিপুরে শাড়ী, কানে দুটো মুক্তো আর নাকে
একটা সবুজ পান্না। আমার মায়ের শ্যামলা রঙে
ওই পাথরটা খুব মানাতো --- শৈশবে অনেক সময় আমি
চেয়ে চেয়ে দেখেছি। হাতে শাঁখা, সোনার চুড়ি ---

যেন ঘরের মধ্যে আলো ছিল। আমি সব কিছুই
স্পষ্ট দেখছি। মা যেন মনে মনে বললে --- কেমন আছিস?
আমি সারা জীবনটা হাতড়ে এলুম মনে মনেই।
মা বললে --- জানি। দ্যাখ তোর কপালে সুখ নেইরে ---
তারপর, একটু থেমে বললে --- তাই বলি কি
তুই চল। এখানে থেকে আর কি করবি?
আমি আবার মনে মনেই মাকে বললুম---
আমিও কিছুদিন থেকে সে কথাই ভাবছি। কিন্তু
ওই যে বোকা সরল ছোট একটা মেয়ে --- আমি
নাতনী বলি, ওটা যে আঁকড়ে আছে ...
মা খুব অল্প একটু হাসলো --- তাতে কোন আনন্দ নেই।
কোন শব্দও হ'ল না, ঠোঁট দুটো চেপে কোণের
দিকে সামান্য বেঁকে গেল। যেমন অন্ধকার রাত্তিরে
উঠোনের তুলসী মঞ্চের কুলুঙ্গীতে নিভু নিভু প্রদীপ
একটু খানি আলো ছড়ায় সেই রকমই।

এবার বললে --- জানি। আবার মায়ায় জড়ালি!
তবে থাক্ আরও কিছুদিন এখানেই। এই বলে
মা মিলিয়ে গেল।

আমার ঘুম গেল ভেঙে
তখন গভীর রাত্রি। অঘ্রাণের ঠাণ্ডায়
রাত তিনটে, আমি মশারীর ভেতর থেকে
টর্চ জ্বেলে দেওয়াল ঘড়িতে দেখলুম। তখনই
আলো নিভিয়ে দিয়েছি, তবু এক পলকে
ঘড়ি ছাড়াও, মোটা চাদরে, আমার গেঞ্জিতে
যে আলোটুকু পড়েছিল তাতে মনে হ'ল ---
মায়ের সেই বিষন্ন হাসিটা সব কিছুতে
লেগে রয়েছে। --- মা নেই।

এখন

অনীক চট্টোপাধ্যায়

এখন নিজেই গড়ে নিচ্ছি
নিজের শরীর
পাল্টেও নিচ্ছি নিজের মত করে
যেমন এ মুহূর্তে বালি দিয়ে
বানিয়েছি হৃৎপিণ্ড
মস্তিষ্কে ভরেছি বাতাস
দারুণ ইলাস্টিক করে
গড়েছি হাতদুটো
যাতে ইচ্ছেমত প্রসারিত করতে
বা গুটিয়ে নিতে পারি

পা দুটো যেহেতু মোমের
তাই উত্তাপ এড়িয়ে চলছি এখন
অথচ কিছুদিন আগে
আমার পা বলতে ছিল দুটো বর্শা
পছন্দসই জমিতে তাই নিজেকে
গেঁথে রাখতে পেরেছিলাম ইচ্ছে মত
একটার পর একটা বুদ্বুদ সাজিয়ে
অতি যত্নে গড়ে তুলেছি এই মেরুদন্ড
এবং চোখজোড়া খুলে রেখেছি আপাতত।
শরীরটাকে এভাবেই
ভেঙ্গে গড়ে চলাফেরা করছি আজকাল,
স্বাচ্ছন্দ্যে।

অতীত

প্রমোদ বসু

অন্ধকার হয়ে এলে আমি এক অন্ধকারে যাই।
দেখি, আমার চেনা কয়েকটি মুখের ওপর
আলো জ্বেলেছে অতীত।
প্রত্যেকটি মুখেই হিম, নির্জনতা, অথচ এখনও তারা
কী ভীষণ জীবিত!

নিঃস্তব্ধ সেই ভ্রমণের পরে
মুহূর্তে মুহূর্তে আমি ঢেকে ফেলি আমার নিজস্ব চোখ-
আর, বুঝি,
বেদনা-বিহ্বল হলে, মানুষের, বেচেঁ ওঠে কয়েকটি অতীত।

এমন কিছু
স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কতগুলো রাত আছে মানুষকে বাসি করে দেয়
সামিয়ানা করে দেয় আকাশকে কতগুলো দিন
কতগুলো কথা আছে অভিধান ফাঁকি দিয়ে যায়
পথিককে দিয়ে যায় কতগুলো পথ শুধু ঋণ
কতগুলো ভাবা আছে অতীতকে সামনে হাঁটায়
পৃথিবীর দু পিঠেই কিছু কালো হয়ে থাকে লীন
কতগুলো চলে যাওয়া মানুষকে আবার বাঁচায়
জীবনকে করে যায় কতগুলো জয়, শুধু হীন...

হেমন্ত
জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়

কি হবে কবিতা লিখে, বলে তুমি ধরাও ফাইল
নথির ভিতর ধুলো, নথির ভিতর মৃত স্বর
পোকা খোঁজো, পোকা বাছো, পোকাজন্ম আমাকে শেখাও
ফাইল চালাই দ্রুত, কোনক্রমে বাঁচাই চেয়ার...

আমার ঝরোখা ছুঁয়ে হেমন্ত কখন চলে যায়!

বাড়িওলা

হারমোনিয়াম ঠেলে, বাড়িওলা
রোজ রাতে রবিঠাকুরের গান গায়!

দূরের নক্ষত্র কাঁপে, ছ'মাস কিরায়া বাকি

আমার দু'চোখ ভেসে যায় ...

থিয়োরি অফ ডাইজেশান
অংশুমান কর

সাপের মতো মাথা যে লোকটার
তাকে বললাম : ‘প্লিজ, আমাকে গিলে ফেলুন’
যেন বুঝতে পারেনি এভাবে অবাক হয়ে
লোকটা দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আমি
কিভাবে ক্রমশ পাল্টে পাল্টে একবার
ডানলোপিলো গদি, একবার ঘর মোছার ন্যাতা আর একবার
পুরু মোটা নারকোলদড়ির পাপোশ হয়ে গেলাম
গিলে নেবার জন্য এগুলো উপযুক্ত নয়
এই চামড়ার দেহ থেকে মেলানিন তাহলে তুলে দিয়ে
আমাকে হতে হতো আরও ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য
তাহলে দয়া হতো, তাহলে পেটে সাজানো
ফর্সা স্যান্ডউইচের মতো আমার একটা খাদ্য খাদ্য ভাব আসত
খক্ করে আটকে যেতাম না গলায়
সাপেরাও বলাবলি করত : ‘বা! এবার বেশ নরম, কোমল হয়ে উঠেছে’
কিন্তু যতক্ষণ বিছানার মতো ঘরমোছার মতো পাপোশের মতো
অস্বস্তিকর অস্পৃশ্য হয়ে থাকবো
ততক্ষণ আড়াল পাবার জন্য সাপের পেটের সেই সরস লালাময়
শোবার ঘরে আমার ঢোকা হবে না যতই বলি না কেন,
‘আমাকে গিলে ফেলুন, আমাকে গিলে ফেলুন, প্লীজ’

ক্ষমতাধীন
যশোধর রায়চৌধুরী

আমার ক্ষমতা আছে, আমি আজ সোজাকে বেঁকিয়ে
আরো সোজা করে দিতে পারি, কিম্বা কাতর পৃথিবী
একদিকে ঠেলে দিয়ে লাফ দিতে পারি বেশ চোদ্দ মিটারের,

মিটার রিডিং আমি ঘেঁটে দিতে পারি, আমি এত শক্তিমান।
ফোন তুলে কাউকে না কাউকে বললেই হয়ে যাবে -
আমার ক্ষমতা আছে। পুরোটাকে দেখাচ্ছি না অবশ্য এখন
পরেও দেখাতে পারি... তুমিও তো জানো সেটা আর ভয়ে
কেঁচো থাকো, কার্পেটের তলায় ঢুকে যাও...

বাংলায় মিটার মানে ছন্দ, আমি ছন্দ ব্যাঁকানোর
ওস্তাদ, কথক, খুড়ো, বাপ।
আমার ক্ষমতা আছে, আমি ঠিক পারি
অক্ষরবৃত্তের আর মাত্রাবৃত্তের মাঝে সরু রাস্তা দিয়ে
হেঁটে যেতে। কোথাও ঝুলি না।
পর্বে পর্বে রেখে যাই নিজস্ব ক্ষমতাদাহ, জ্বালানি, ইন্ধন...

আমার ক্ষমতা আছে, আমার ক্ষমতা আছে। এত করে বলি
তবু কেন নিজেকে ঠিকমত বিশ্বাস করাতে পারিনা ?

আমি ভূতগ্রস্ত কবি
পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমি ভূতগ্রস্ত এক সম্মোহনী শব্দের শিকারী;
আজন্ম তাড়িত আত্মা, অস্থির, প্রশান্ত, সিদ্ধবাক্ ;
যে তীক্ষ্ণ আঘাত করে, আমি পায়ে নত হই তারই,
যদি সে পোড়ায়, আমি পুড়ে পুড়ে হয়ে যাই খাক্,
এবং উদ্ভূত ছাই ভরে রাখি শব্দের কলসে;
স্রোতে ভেসে যেতে যেতে যে খুঁজে ফিরছে খড়কুটো
ভাঙন - ভঙ্গুর পাড়ে দাঁড়িয়ে, নিজেরই মুদ্রাদোষে
টেনে তুলি তাকে। নেই আমারই আশ্রয় চালচুলো।

আমার পায়ের কাছে অনন্ত গহ্বর মুখ মেলে
প্রতীক্ষায়; তার চাওয়া সামান্যই - খেতে চায় দেহ
জ্বলন্ত শরীর নিয়ে আমি ছুটি দর্পিত পা ফেলে;
কখনো দিগন্ত জুড়ে হাত পাতি...বিশাল...সস্নেহ;
সেই হাতে ভিক্ষাপাত্র - প্রেম আর মৃত্যুর ভিখারী।

আমি ভুতগ্রস্ত কবি, সারাবিশ্ব গিলে খেতে পারি।

দহন
সন্তোষমুখোপাধ্যায়

অহেতুক শ্যামরাত্রি, অবুঝ পাতার হাতছানি
ঝড় নিয়ে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ে ভিতরের ঘরে
আমি তার লাবণ্য কি দহনের কতটুকু জানি
সারাদিন যদি কাটে শস্যকণা, গান ভিক্ষে করে।

অথচ নিষিক্তবেলা ঘরবাড়ি ছুঁয়ে গেছে কবে
তার ছিন্ন যাত্রাপথ বাতাসের কিছু কাছাকাছি
আমাকে টুকরো করে নিয়ে গেছে বিষন্ন নীরবে
দেখে আমি ধুলোপথে কতভাবে ভেঙে পড়ে আছি।

অহেতুক শ্যামরাত্রি, অবুঝ পাতার হাতছানি !
অমি তার লাবণ্য কি দহনের কতটুকু জানি !

ওয়ারিশ

অ((তী চট্টোপাধ্যায়

পান্থশালার দরজায় বাইরে অপেক্ষা না করেই তুমি ফিরে যাচ্ছ
আমিও তাই কর্তব্যের কাছে পরাস্ত, কর্মসূচীতে আকন্ঠ ঢেউ,
ইচ্ছে ছিল তোমাকেই ওয়ারিশ করে যাব এই গ্রাফিক জীবন
ইচ্ছে ছিল চার মাস বর্ষার পর ফিরিয়ে দেব অনন্ত শরৎ
তখন তুমি ইচ্ছেমতো ছিঁড়ে নিতে পারো মেঘের কোলাজ
বসন্তের গুলমোহরী ঈর্ষা জিইয়ে রাখতে পারো নিঃশ্বাসে।

অরণ্যস্তব্ধ অন্ধকারে তখন হয়তো সূর্য নেই যে পথ দেখাবে।
আমার সফল শয্যার উপর দিয়ে হেঁটে যাবে ঝরা পালক নীলকণ্ঠ
ছন্দোবদ্ধ দীঘল হাত থেকে খসে পড়বে আরবী ঘোড়ার লাগাম
মদের পাত্রে দোল খাওয়া আকাশ ভরে উঠবে হাহাকারে -
ফ্যাকাশে কোন জোছনায় পবিত্র আগুনকে জিজ্ঞেস করো,
মৎস্যকন্যা বলবে তারই কথা, নাগাল ছাড়িয়ে আরও অতলে ।

গুপ্তঘাতক যারা , তারা তোমায় চিনিয়েছিল মৃতদেহের পোড়াসুবাস,
মিথ্যে পড়ে রইল তোমার পাপড়ি মেলা দর্শন, রাঙ্গাজবা করতল।
সত্য প্রমানের যাবতীয় অস্তিত্ব ছিঁড়ে গেল নীল নিষ্ঠুরতায় ।
ইচ্ছেছিল এই অনন্ত শরৎ, গ্রাফিক জীবন তোমাকেই ওয়ারিস করে যাব,
বিশ্বাসহীনতার কাছে পরাজিত স্মৃতি আজ কেবলই মোহগ্রস্ত।

হাতে পায়ে শেকল বেঁধে নোঙরবন্দী হব তোমারই বন্দরে,
সযত্নে জলবে শুধু একটি পিদিম মৃত্যুহীন রাজকীয় উদাসীনতায়,
সূর্য ডোবার পরে জেগে উঠবে প্রতিবেশী চাঁদ আজ রাতেও
মধ্যযামে দিশাহীন চোখে তখন ফিরতে তোমায় হবেই।

তদন্ত
তমালশেখর দে

আমার ঘরে হঠাৎ-ই ঢুকে পড়ল -- সশস্ত্র তিনজন। বলল -- তুমি প্রমাণ করো -- তুমি নিরস্ত্র।
বললাম -- আপনারা আমার যাবতীয় সব কিছু খুঁজে দেখুন। ... এই আমার হাত, দরজা --
জানালা, বাসনপত্র, খোলা বই। ওরা তিনজনই প্রায় একই সাথে বলে উঠল -- ঠিক আছে,
আপনি আমাদের সব খুলে খুলে দেখান, এবং অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন
পদার্থের একটা তালিকা তৈরি করুন।

তারপর থেকেই আমি কাগজ - কলম হাতে কেবল ছুটছি ছুটছি, রাত তলিয়ে যাচ্ছে অথচ
তালিকার অন্ত নেই, শেষ অবধি ভোরের আলো ফোটার আগেই তালিকা জমা পড়ল।
আমি হাঁফাতে থাকলাম, গুনতে থাকলাম মুক্তির প্রহর।

তিনজনের প্রত্যেকেই একবার একবার করে পাতা উল্টাতে উল্টাতে মাথা নাড়ল।
অবশেষে ঘোষণা দিল ঃ হল না। এরপরও তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তুমি নিরস্ত্র।

বালুঘর
প্রদীপ চক্রবর্তী

বন্দিশালায় ফন্দি এঁটেছে মন,
অমল গন্ধ বাতাসে মুক্তি খুঁজি
লুকিয়ো আমাকে স্বপ্নের তপোবন,
প্রদীপের নীচে ছায়াঘেরা পিলসুজে।

নিয়মমাফিক তেরো পাবনেই আমি --
একা একা ফিরি মিছিলের মুখ দেখে,
বিষণ্ণ থাকা স্বাভাবিক পাগলামি,
নিটোল একলা দুঃখ স্পর্শ মেখে !

কবিতায় তুমি জীবন রাখছো বাজি,
বাস্তবে দেখি ঘোরতর বিপরীত !
তোমার সঙ্গে নরক বাসেও রাজি
এমন দাবি কি করেছিলে কদাচিৎ ?

মানুষের ঢল যখন দেখেছি পথে,
জনসমুদ্রে খুঁজেছি মায়াবী চোখ,
ঝিনুক কুড়িয়ে কাটাইনি সৈকতে,
রচে নিজেকে দিয়েছি স্তোক।

জানি না, তুমি সত্যি কি আছো ভালো
এত কালোমাথা হট্টমেলার দেশে ?
বন্দিশালায় জ্বালাই না ভয়ে আলো,
পাছে দেখি কোনো ভীষণ সত্য শেষে !

এত কালো, এত কালো যদি পৃথিবীর বুকে ভাসে,
তবু এত আলো, এত আলো কোথা থেকে আসে?

পরিব্রাজক
সনৎ বসু

ফুল তার প্রিয় খুব
আর প্রিয় নারী
সবুজ দ্বীপের খোঁজে
ডিঙা ভাসায় জলে সংসার আনাড়ি।

আকাশ পাঠায় চিঠি
মরু ও পাহাড়
আঙিনায় নৃত্য করে।

অপরাহ্নে যদি
বাতাসে মাতন লাগে
আলোয় আলোয় সাজে মেঘের মিনার,
সে তখন বোবা চোখ, মুগ্ধ বালক
বেমালুম ভুলে যাওয়া ইহ - পরলোক
সে তখন খড়কুটো, পাখির পালক।

ফুল তার প্রিয় খুব
আর প্রিয় নারী
মহাজীবনের ডাকে
জন্ম পথিক হাঁটে
কচ্ছ থেকে কন্যাকুমারী।

বিষাদ গান
সুপ্রিয় ফণী

পায়ের নীচে স্মিতপাথর ছিল।
দুহাতে চাঁদ, জ্যোৎস্না ভাঙা জল,
চোখের কাছে চোখ ধাঁধানো মুখ,
ভিতর বুকে তুমুল দোলা চল।

পায়ের নীচে পাথরে ধার ছিল।।

হাতের কাছে বন্ধু ছিল, ঘরে
বন্ধ রেখে মনকেমন খাম
ইচ্ছে মতো আগুনে হাত ধরে
বিষাদবহ ইচ্ছা পোড়াতাম।

হাতের কাছে বৃষ্টিধারা ছিল।।

সহজ ছিল পুন্য তথা পাপ,
প্রথাবাহির সকল লেন দেনে
নিষেধ ছিল মহামনস্ তাপ
শিলালিপির অমোঘ পাঠ মেনে
পথের ধারে ভুল নিশান ছিল।

পায়ের নীচে মৃতপাথর ছিল
একটি-দুটি স্মিতপাথর ছিল।।

আত্মকথা
সংঘমিত্রা বসু

মাঠ থেকে রোদ কুড়িয়ে ঘরে ফেরে মেয়ে,
এসেই ধূলোপায়,
মাঠের দুঃখ লিখে রাখে সবুজ খাতায়।
পড়শীরা অবাক!
কবিতা-লেখা-মেয়ে! কিছু নেই কানে বা গলায়!
একরাশ খোলা চুল ভরসন্ধ্যায়!
দুপুরটা চুপচাপ বেশ কেটে যায় পরচর্চায়। মধ্যবিত্ত পাড়ায়।
ও মেয়েটা অন্য কিছু ভাবে - অকাজ করে সময় কাটায়।
একলা জানালার কাছে তার একটা নিজস্ব অধিকার আছে,
অধিকার আছে ব্যক্তিগত বেঁচে থাকায়।
মানুষ এসব কথা কেন ভুলে যায়!
শ্বাসকষ্ট বাড়ে তার। কেন যেন শ্বাসকষ্ট হয়।
তারপর একদিন মেঘলা হাওয়ায়,
ভাঙাপাঁচিলের ইঁট থেকে হলুদ ফুলের কুঁড়ি মাথাতুলে চায়।
মেয়েটাকে কাছে ডাকে।
বলে 'আমিও এইখানে আছি, থাকব, সম্পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায়।'
মেয়েটা পালকের মতো ছাদে উড়ে যায়।
আগামী ফুলের কামনা -- আকাশের রঙ যেন লাগে ওরগায়।

বিন্তিরবাবা যেদিন স্বর্গে গেল
পার্থপ্রিয় বসু

বিন্তির বাবা যেদিন স্বর্গে গেল
সেদিন থেকে বিন্তিরমা-র
দিনরাতের হিসাবে মেলে না
কাকজ্যোৎস্নায় উঠে সেঘরদোর মোছে
বিন্তির গায়ে কাঁথাটেনে দেয়
এটা সেটা গুছিয়ে রাখে
মেয়ের জন্য মেথির জল, নিমপাতার রস,
কাঁচা হলুদ বাটা, শঙ্খেরগুঁড়ো
যেটাই যখন মনে পড়ে
রাতভর সেটাই মনেপড়ে

এর পরও যখন রাত যাইযাই করেও
আলসেমিতে জগদ্দল হয়ে থাকে
বিন্তির মা মেয়ের মুখের দিকে তাকায়

মেয়ের দিকে তাকালেই
পুব-আকাশে লালচে আলো ফোটে
জগৎ আরো এক - পা লাট্‌খেয়ে
ভোরের দিকে এগোয়...

বিন্তির সব কেমন গোলমেলে লাগে
পার্থপ্রিয় বসু

বিন্তি অপ্সরা হয়েও ঘরসংসারের কাজ সবই পারে
কিন্তু আশ্বিনের বাতাস যখন সেগুনমঞ্জরীতে দোলা দেয়
যখন রোদের মধ্যেই এক পশলা বৃষ্টির তীর
মাটিতে পড়ে গিয়ে গেঁথেযায়
যখন কাজল কিংবা জুহিচাওলা
মালভূমির ওপর ঘাসেব(বেন বা সরষে খেতে
কাঁধের দুপাশে ওড়নাউড়িয়ে
সারসের মতো উড়ে যায়
বিন্তির মন কেমনকরে

বিন্তির সব কেমনগোলমেলে লাগে
অঙ্ক কষবে না, আর কিছুতেই অঙ্ক কষবে না ভেবে ভেবে
বেহিসেবী হতেই
তার স্বপ্নের মধ্যে দুটো ত্রিকোণমিতি,
তিনটে জ্যামিতির উপপাদ্য,
আর পাঁচটা সুদকষা, হুশ করে ঢুকে এল
বিন্তিকে এখন স্বপ্নের নীল আলোয়
চোখ জ্বালিয়ে চক্রবৃদ্ধি, লাভ ক্ষতি,
বর্গক্ষেত্র ত্রিভুজের হিসেব কষতে হচ্ছে
চিৎ হয়ে আলাভোলা শিবের মতো যে ঘুমোচ্ছে
ও কে - বিন্তিরস্বামী না ক্লান্ত কিন্নর

বিন্তি ভেবেছে মেয়েরা কম কিসে!
পার্থপ্রিয় বসু

বিন্তি ভেবেছে মেয়েরা কম কিসে !
সে তাই শার্ট প্যান্ট পরে
সাইকেল, মোটরবাইক , স্কুটার চালানো
ব্রিচেস পরে ঘোড়ায়চড়া, রাইফেল ছোঁড়া, বক্সিং
পোল্ ভল্ট, হাই জাম্প, লংজাম্প, সাঁতার
কোনো কিছুতেই কসুরকরে নি

বিন্তি ভাবে এমন পুরুষকে সে বিয়ে করবে
যার কাঁধে তার কাঁধ, হাতে হাত
বাঁচা-মরা সমান সমান
সংসারের অর্ধেক খরচ তার, বাকি পুরুষের
অর্ধেক আলো তার, বাকি পুরুষের
কিন্তু অন্ধকার !
অন্ধকারও কি এভাবে ভাগ করতে পারবে সে !

এইখানে ঘুমভাঙা শেষরাতের আকাশ
চাঁদ-সূর্যহীন নিরালোক এসে গ্রাস করে তাকে ...

রণজিৎ দাশ

কে মোছে আঁধার রাত্রি? স্টেশনের কৃষ্ণচূড়া গাছ
সবুজ পাতায় আর লাল ফুলে মুছে দেয় আনাচ কানাচ
কালিপড়া লণ্ঠনের, যে লণ্ঠন পঞ্চাশ বছর
জ্বলেছে অবৈধ কামে; নিজের ধোঁয়ায় নিজে অন্ধ, অবান্তর
কে তাকে উজ্জ্বল রাখে, আমার শিয়রে সারা রাত?
প্রতিটি সুন্দর দৃশ্য বালিকার কালি মোছা হাত

নিজস্বতা
মহম্মদ রায়হান

প্রত্যেকটি মানুষের একটি করে
নিজস্ব নদী থাকা দরকার,
যে নদীতে সে স্নাতক হয়ে
সমস্ত দুঃখ এবং অহংকার ধুয়ে
নির্মল হতে পারে।

প্রত্যেকটি মানুষের একটি করে
নিজস্ব চাঁদ থাকা দরকার,
যে চাঁদের আলো ছুঁলেই সে
ভালোবাসার ফুল ফোটাতে পারে -
গাইতে পারে মহাসাম্যের গান।

প্রত্যেকটি মানুষের একটি করে
স্বাধীনস্বদেশ ভূমি থাকা দরকার,
যেখানে সে ইচ্ছামত
বিপ্লবের আগুন জ্বালাতে পারে -
পোড়াতে পারে পৃথিবীর যত পাপ।

প্রত্যেকটি মানুষের একটি করে
নিজস্ব স্বপ্ন থাকা দরকার,
যেখানে সে মনের মতো বাগান তৈরী করে
রং বাহারী প্রজাপতিদের সঙ্গে
খেলে বেড়াতে পারে দ্বিধাহীন অনন্ত কাল ধরে।

শূন্য ঘর
রুচিরা শ্যাম

আমার বাড়িতে আছে জনৈকের তালাবন্ধ ঘর
কখনো দেখিনি তাকে জ্ঞানাবধি, চাবিটা পেয়েছি
মাঝে মাঝে কারো উক্তি শুনে ভাবি এই সেই লোক
তার হাতে চাবি দিই তালাটা তো তখন খোলে না।
ঘরটা বেবাক ফাঁকা তবু তার টান আছে বেশ
মাঝেমাঝে সেটা খুলে মাঝরাতের সময় কাটাই
কেউ বলে এটা নাকি ছিল গৃহদেবতার ঘর
বাস্তুহারা লোকগুলি চলে গেছে দেবতাসমেত।
ঈশ্বর কি শরণার্থী সে কি খোঁজে নিজস্ব ঠিকানা
সে কি নিরুদ্দিষ্ট শিশু ভুলে গেছে তার ডাকনাম,
আজ বিশ্বে জানি তার আশ্রয় সহজ নয় পাওয়া
আমি ঘর আগলে আছি যদি সে হঠাৎ এসে পড়ে।

অন্তবিহীন
উজ্জয়িনী দে

কেউ কেউ আছে যারা সূর্যকে ফুল ভাবে।
কেউ কেউ আছে যারা বিষ পান করে,
অমৃত ভেবে;
আমিও তাদের দলে, তারাই বন্ধু আমার।
হৃদয়ের গোপন কামনায় বলি,
কোনো এক প্রবল ঝড়ে ঘুচে যাক্
আমার গৃহবাস, গৃহ হোক কোনো
বহমান নদী।
তবেই সুবাতাস বুকে হেঁটে যাব
অনন্ত পথ...।

আলোছায়া
রুদ্রশংকর

জীবনের যোগফল একবার শূন্য হয়েছিল
--একবার একশ
তাই একদিন সময়কে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে
পবিত্র হৃৎপিণ্ড থেকে উঠে এলো
আমাদের আবক্ষ অন্ধকার
তবু আমার বুকের মধ্যে
আকাশ সহবাসের ভয়ার্ত আসক্তি,
আমাকে নির্মল করতে চাও করো
হে আমার অস্তিত্ব;
এসো রাত পাখি, কুলীন মেঘের অভিসারে এসো
আমার আমিত্বে যেন রেখে যেতে পারি
বিচ্ছেদের নতুন সসীমতায় সময়ের আলোছায়াগুলো।

এপিটাফ
যুগান্তর চক্রবর্তী

সমস্ত লেখার পরও বাকি থেকে যায় শেষ লেখা
যা লেখে সকলে, তাই কিছু পৃষ্ঠা থেকে যায় বাকি --
শিরোনামহীন কিছু সাদা পাতা
স্বাক্ষরবিহীন
সব কবিতারও পর বাকি থাকে একটি কবিতা
যা লেখে অজ্ঞাতনামা কবি এক --
অগ্নিতে
জলে
বল্কলে
শিলায়।

লেখা
সুপ্রিয় ফণী

লিখে রাখো।

মহুয়া মাদল রাত্রি, চন্দ্রাহত জল
লিখে রাখো।

লেখ প্রেম, লেখ ঘৃণা
(কবিরাই লিখে রাখে কিনা!)
অভিমানী মুখ, একা থাকার অসুখ,
সন্ত্রাসের মাটি ও ফসল

লিখে রাখো।

পথ

জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়

কত ঘোড়া থাকে আস্তাবলে
কথা শোনে, ঠুলি পরে পরিমিত দানাপানি খায়
চাবুক সজাগ রাখে, সহিসের মৃদু ইশারায়
চেনা ছকে ঘুরে আসে ভিক্টোরিয়া, চিড়িয়াখানায়

একটা অবাধ্য ঘোড়া বৃত্ত ভাঙে, খেলার নিয়ম...
মধ্যরাতে তাল ঠোকে, মুখে ফেনা, কেশর ফোলায়

মশাল জ্বেলেছে চাঁদ, পথ জাগে, নুড়ি চমকায়!
গ্যালপের শব্দ শোনা যায়...

আমি কে?
অর্নব সাহা

আমার পিছনে ঘুরছে ‘পাফারাৎজি’, ঝানু সাংবাদিক
আমার দুপাশে হাঁটছে ‘কবি’ - নামধারী নপুংশক
আমার বীরত্ব নিয়ে তথ্যচিত্র দেখাচ্ছে বি.বি.সি.
আমার নিহিত প্যানে-এ সিঁদ কাটছে দুঁদে গোয়েন্দারা

আমার বাপান্ত করছে মাঝবয়সী কবি - দম্পতিরা
গোপন ক্যামেরা নিয়ে ফলো করছে ‘প্রেস’ লেখা গাড়ি :
যখন যে রাস্তা ধরে হাঁটছি, তার একটা গলি আগে
লুকোনো বন্দুক হাতে কেউ হয়ত অপেক্ষা করে আছে...

আমার হাতেরলেখা জাল করছে হস্তরেখাবিদ্
আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট রাখা আছে ফরেন্‌সিক দপ্তরে
দৈবাৎ ভেজা বালিতে যদি পায়ের ছাপ রেখে যাই
অমনি তার দৈর্ঘ্য - প্রস্থ মেপে নিচ্ছে সেপাই - সান্ত্রীরা

আমি জঙ্গি, আততায়ী, আমি এক জ্যান্ত বিস্ফোরক
মালদা থেকে পুরুলিয়ায় আমার বিস্তীর্ণ ‘মুক্তাঞ্চল’
একদিন আচমকাই ঘটিয়ে দেব গণ - অভ্যুত্থান
আমার লাল পতাকা উড়তে থাকবে বাড়িতে বাড়িতে...

আলো-স্বপ্ন কালো
গৌতম মুখোপাধ্যায়

এত কালো, এত কালো যদি পৃথিবীর বুকে ভাসে,
তবু এত আলো, এত আলো কোথা থেকে আসে?
এত স্বপ্ন যদি ঘুমের ছায়ায় আসে
এত তারা যদি আকাশের গায়ে ভাসে,
এত সুর যদি কণ্ঠেতে ফিরে আসে,
এত প্রজাপতি যদি ফুলের কথায় হাসে,
এত রঙ, এত রঙ যদি পৃথিবীর বুকে ভাসে,
তবু এত কালো, এত কালো কোথা থেকে আসে?
যদি দখিনা বাতাস চুপিচুপি থেমে যায়,
যদি শিশিরের ফোঁটা মাটির বুকেতে মিশে যায়,
যদি দিক্‌হারা বক ক্লান্ত পাখায় ফিরে যায়,
যদি এত সুর তার স্বরলিপি ভুলে যায়,
যদি এত তারা জ্বলে জ্বলে নিবে যায়;
এত কালো, এত কালো যদি পৃথিবীতে ছেয়ে যায়,
তবু এত আলো, এত আলো কোথা থেকে আসে?

এত কথা যদি মনের গোপনে পায় স্থান,
এত ভালোবাসা যদি ভেঙে দেয় অভিমান,
এত অপমান যদি পায় তার প্রতিদান,
এত অশ্রুতে যদি দু-চোখেতে ডাকে বান
যদি এত পাখি ভুলে যায় কুহুতান,
যদি শিশুর স্বপ্নে জেগে ওঠে শয়তান
যদি এত ব্যথা, এত ব্যথা পৃথিবীতে ছেয়ে যায়,
তবু এত আলো, এত আলো কোথা থেকে আসে!

কোলাহল থেমে গেলে
বিশ্বনাথ সিংহ

পড়ে থাকে জ্ঞান
একটি উজ্জ্বল সারস খুঁটে নেয় তাকে
সারল্যের বাঁকে বাঁকে পাষাণপ্রতিমা
মঙ্গলশাঁখে ফুঁ দেয়, কাকে যেন ডাকে।

সরে গেছে বান, পড়ে আছে পলি
অজস্র প্রাণের বলি--
প্লাবিত জ্যোৎস্নায় কাটা হেমন্তের ধান
চাষী জানে এ-ই বিদ্যা, আর জানে আহত অঘ্রাণ।

কোলাহলে কোলাহলে অন্নে মেশে নুড়ি ও কাঁকর,
এখন তিনিই প্রভু, বাকি সব চাকর-বাকর।
ডানাভাঙা মাছরাঙা ভোরবেলা ছড়িয়ে রঙ,
পাড়ে বসে শিক্ষা দেয় এই হলো শিকারের ঢঙ
এবং দীক্ষা দেয় ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়ো হে বালক --
ডাকছে নাবাল জমি, ছেঁড়া তার, ছিন্ন পালক।

পড়ে থাকে জ্ঞান
একটি উজ্জ্বল সারস খুঁটে নেয় তাকে
সারল্যের বাঁকে বাঁকে পাষাণ প্রতিমা
মঙ্গল শাঁখে ফুঁ দেয়, কাকে যেন ডাকে।

তখন
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'যে পথে রাজা উজীররা যাতায়াত করেন
তাদের বলে রাজপথ।
ওরা যান ঘোড়া বা হাতির পিঠে চড়ে --
পা-ই যাদের একমাত্র সম্বল, তারা সাবধান।'

রাস্তা তো হাঁটার জন্যই।
যাদের ঘোড়া যাদের হাতি, ওঁরাও কি পারেনা
একটু সামলে চলতে?
নইলে--সময় তো আর রাজা-উজির বোঝে না
বেশি বাড়াবাড়ি করলে সে-ও বলবে 'হটো'।

তখন কোথায় থাকবে হাতি আর ঘোড়া?
গোটা রাস্তাটাই তো ওদের ছেড়ে দিতে হবে।

রণপা
কৃষ্ণ ধর

আমি দেখি চারদিকে অনেক রণপা হাঁটাহাঁটি করেন
মাটির ছোঁয়া বাঁচিয়ে কাঁহা কাঁহা সব চলে যান ওঁরা
হাঁটা দেখলেই বোঝা যায় সত্যবাদীর রথের চাকার মতো
কখনো ধুলোমাটিতে মাখামাখির ব্যাপার নেই।
মুখ দেখতে হলে ওপরের দিকে তাকাতে হয়
যদি প্রণম্য রণপাগণ একটু স্থির হয়ে দাঁড়ান

সারি সারি রণপা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন জনপদ তৃণভূমি
কেঁচো কেন্নোরা মুখ তুলতেই পায় না

একটাই শুধু মুস্কিল এদের নিয়ে
কখনো কখনো রণপাও হড়কে যায়
তখন এতিমখানার ক্ষুদে শয়তানগুলো হাততালি দিয়ে ওঠে
কেঁচোগুলোও তখন মাটির ভিতর থেকে
ওপরে উঠে আসার সুযোগ খোঁজে
হাড় - চমকানো রণপাগণের জন্য তখন
বিজ্ঞাপনের বিরতি

হয়তো অপেক্ষায়
পরমার্থ প্রতিম দাশ

যে বালক একদিন পোশাকহীন রাজাকে দেখে বলেছিল--
এ রাজা ন্যাংটো। এ রাজা উলঙ্গ।
হাততালি দিয়ে পৃথিবীকে চড় মেরে বলেছিল
তুমি মুর্খ। আলো দিয়ে অন্ধকার ঢাকতে চাও
পাথরে বসত বানানোর চেষ্টা
নারীর নদীর মতো সব পাপ ধুয়ে দেয় জলে,
এটাও বুঝলে না!
গায়ে কালি মেখে থাকো নির্বোধ আনন্দে মশগুল।

হা, হা সে বালক আজ নিজেই রাজা
কুলুঙ্গিতে জমানো পয়সা বিলিয়ে দাও দু-হাত তুলে
তার আর দরকার নেই।
খিদে-বাঁচিয়ে রেখে দেওয়া খুঁদকুড়ো হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে
করো আনন্দ-উদ্দাম।
গোকুলের মা ভাবে, এই বার মরা বুকে বাণ ডাকবে।
ছেলেটা আমার দুধ বড় ভাল খায়।

যে বালক রাজাকে উলঙ্গ দেখেছিল।
সে-ই আজ রাজা।
পঁচাত্তর বছর বাদেও মারণ-ব্যাধি যেমন ফিরে ফিরে আসে
গভীর আকাশের বিস্ফোরণ যেমন কোলে টেনে নেয়
আরও গভীর আকাশ
তেমনই এই রাজাকেও উলঙ্গ দেখার জন্য
হয়তো অপেক্ষায় আছে, অন্য কোনও বালক।

আনন্দ-তালিতে সে-ও বলে দেবে
এ রাজারও পোশাক নেই

তিনটি অণু কবিতা
দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়

১। দু'টি রাজনৈতিক শব্দ

সম্প্রীতি এবং জনসেবা শব্দ দু'টির চারধারে
নানা রঙের ঝান্ডাগুলি ব্যারিকেড গড়ে তোলে
সাদাপাতায় শব্দ দুটিকে লেখার চেষ্টা করলে
'লাশ কাটা ঘরে' রাত কাটাতে পারো!

২। কবিতা যখন হাভাতে খোকা

ছন্নছাড়া কবিদের ফাইলে উইপোকা লাগে না
তাদের কবিতাগুলি হাভাতে খোকার মতো ঘুরে বেড়ায়
এবং অন্ধ সময়কে হাত ধরে রাস্তা পার করে দেয়।

৩। কলমের নলই চেতনার উৎস

কলমের আকৃতি অনেকটাই
পাইপগানের মতো
সুতরাং, তুমিও যুদ্ধে যেতে পারো;
গণতান্ত্রিক দেশ - ইচ্ছেটা তোমার নিজস্ব।

বিশ্ববাড়ি
অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী

১।
আমাদের তাড়াতাড়ি নেই
আমাদের বাড়াবাড়ি নেই
আমরা তো রয়েছি বাড়িতেই

২।
বাড়ি তো একটাই
শুধু এ ঘর থেকে
অন্য ঘরে যাই ...

স্বকাল
অনির্বাণ দাস

সকালে তর্পণ মানায়, প্রভাতী তর্পণ

ঘুম থেকে উঠে ভোরবেলা
আমার তো তর্পণ নেই , টিউশান আছে

তর্পণ আমার ছাত্র, ক্লাস নাইনে পড়ে

অনির্বাণ - তর্পণের মাঝখানে
না, শান্তি জল ঠল নয়
থাকে নোটের বিশ্বাস

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু

বোকা সৈনিক
মুর্শিদ হাসান

যুদ্ধে জিতে
এক বোকা সৈনিক হঠাৎ বুঝতে পারে
যুদ্ধে শুধু শকুনের লাভ হয়

তার থেকে
দু'ছড়া ধান বুনলে বরং ভালো হতো।

নদী
রতনতনু ঘাটী

মানুষ নদীকে ভাগ করে
নদী কখনও ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করে না।

মানুষ নদীকে সীমানা মেনে সীমান্ত রচনা করে
একই নদীর কিছুটা জল এক দেশের, কিছুটা অন্য দেশের।
জল কখনও ভাগ হয় না। এক সঙ্গে বয়ে যায়।

দু'দেশের মানুষের দু'রকম পরিচয়পত্র আছে
পৃথিবীতে নদীর কোনও পরিচয়পত্র নেই।
মোহনা ভালবাসে, ভালবাসে সমুদ্রে মিশে যেতে
এক দেশের মানুষ সহজে অন্য দেশের হতে পারে না
তাকে এক দেশের পরিচয় ত্যাগ করতে হয়।

মানুষ নদী ভাগ করে
নদী কখনও ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করে না।

মানুষের জয়যাত্রা
সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষ যেখানে যায় গাছ তার সাথে সাথে যায়
মানুষী যেখানে যায় ফুল তার চুলের নিশীথে
আলো জ্বালে, সেই আলো মানুষের বুকে
আলো জ্বালে আলো থেকে আরো আরো আলো।

ধেয়ে আসে পৃথিবীর দিকে আর হাজার বছর
পার হয়ে যুদ্ধ আর দু-চোখের জল
মানুষকে কত দুঃখ দেয় তবুও মানুষ
কেন বারে বারে ডেকে আনে মায়া বিপন্নতা

গোষ্ঠী থেকে দল থেকে সঙঘবদ্ধতার দিকে
এই যে মানুষ আজো ধেয়ে যায়
মাতৃগর্ভ থেকে ছিঁড়ে আনা শিশুকেও মারে
কেউ কেউ আগুন নিভিয়ে দিতে যায়

মানুষ - মানুষী যদি হাতে হাত আগুনের দিকে
এক সাথে হাঁটে, সে বড় সুখের দিন হবে।

নাকছাবি
সন্তু বসু

চৌরাস্তার মোড়ে বাঁ দিকের গলির মুখে,
লোডশেডিং- এর ঘোমটার নিচে কুপি জ্বেলে,
মেয়েগুলো নাকছাবিটার আগুনে ফাঁদ পেতে বসে
শিকারের আশায়।
পেটে তাদের নেকড়ের ক্ষিদে।
ক্ষিদের দাঁড়ি পাল্লায় দরদামের বাটখারা চাপায়।
পাড়ার আধপাগলা ছেলেটা এঘর ওঘর দাপিয়ে বেড়ায়
সন্ধের ছায়ায় নাকছাবিটার কাছে গিয়ে বলে
আমায় বিনি পয়সায় কিনবি?
‘আয় কোলে আয়’ বলে, পাগলটাকে বুকে চেপে ধরে
নাকছাবিটা হঠাৎ যেন মা হয়ে যায়।

এইসব দেখে নিয়ে, মেখে নিয়ে সারা গায়ে, চোখে
এইখানে এসে, ফের ঈশ্বরের নবজন্ম হয়

প্রভাত

আলিফ নবী ওমর

ফুলশয্যা ছেড়ে সোনার আলোয়
শিশিরভেজা বিস্মিত প্রভাতে তিনি চলেন
পুরো বহিরিন্দ্রিয় লুধিয়ানার পশমে আবৃত
যেন কাঙ্খিত উত্তাপের সদর্প শংসাপত্র।

মুখের সন্ত্রস্ত হাসির এটেস্টেড করা রবারস্ট্যাম্প
ঠিক সর্ষেফুলের মতো স্বপ্নময় বিকাশ
কার্ডিগানে ক্যালেন্ডুলার চঞ্চল গন্ধ
আমার আরক্ত চোখের মুভি ক্যামেরায়
কম্পমান সাতসকালে
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বন্দি হয়ে যায়।

রাস্তার অপর প্রান্তে হাঁপানির টানে মর্গের ছাপ
শৈত্যপ্রবাহে ভস্মীভূত মুখমন্ডল কঠিন দেখায়
সূর্যের উত্তাপ শুরুর দশ মাস দশ দিন আগে।
অগ্নিকুন্ডের কাছে বাঁচার একটু ফসফরাস চায়।

ফুট শিশুরা বৃত্তাকারে আগুন উস্কে দেয়
তপ্ত হয় সারি সারি পাঁজর
সূর্যঘড়ির কিরণে বাজপাখির ক্ষিপ্ততা পায়
একটু পরেই ডেলিপ্যাসেঞ্জারের হুটোপুটি।

হাসপাতালের রাত্রি
অংশুমান কর

খবরকাগজের পাশে পলিথিন শিট, পলিথিন শিটের পাশে ছেঁড়া চাদর
ছেঁড়া চাদরের পাশে এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় শুয়ে
হাইস্কুলের মাস্টারমশায় থেকে রিক্সাওয়ালা
বাবা-মা-ছেলে-মেয়ের অসুখ পাহারা দিচ্ছে
যেন
রাতের আকাশের লক্ষাধিক তারা
পাছে কোনও বিপদ হয়, এই ভয়ে
ঘুম তাড়াতে তাড়াতে
সারারাত পৃথিবীর অসুখ
পাহারা দিচ্ছে ।

ধরিত্রী
সুমন গুণ

খোলা মাঠের মাঝপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যে - বউটি, তার
বাড়ি, সম্ভবত, মুকুন্দপুরে। বাড়ির সামনে
তেল - লজেন্সের দোকান, ঝাঁপতোলা, সেখানে কানে বিড়ি গুঁজে,
তার বর কেনাবেচা করে, হাঁটুর ওপর গোটানো লুঙ্গি,
তিনটে ছোটো ছোটো মেয়ে আর একটি ক্ষুদ্রতম ছেলে
সামনের রাস্তায়, দোকানের চৌকিতে, মাটিতে
লাফঝাঁপ করে, চেঁচিয়ে।

গোয়ালপাড়া থেকে ব্যাগ সেলাইয়ের টাকা নিয়ে
ফিরছে বউটি, মাঠের ওপারের দোকান থেকে
নিঝুম তেজপাতা, কলাইয়ের ডাল আর চারটি কাঠিলজেন্স
কিনে, বাড়ি গিয়ে, দুপুরের উনুনে
ভাঙা পাঁচিলের ধারে বসে বসে তৈরী করবে
সংসারের ঝোল ও মশলা

তারপর কলে যাবে

কাকদ্বীপ
উত্থানপদ বিজলী

খোড়ো - ঘরে রেখে যাচ্ছে - বউ
ক'টি আদুল ছেলে মেয়ে
রেখে যাচ্ছে - থালা বাসন ঘর গেরস্থালি,
আবার ফিরতে তো সেই পক্ষকাল!

ট্রলারে বরফ আছে। তোলা হচ্ছে - কাছি,
রূপালি ইলিশ-ধরা নাইলনের জাল,
নিজেদের রসদ, মায় তেষ্টার জল।
হাঁকাহাঁকি চেঁচামেচি ...
জোয়ারের নোনা জল জেগে ওঠে ক্রমে
এখনই ছাড়বে ঘাট জেলে এবং মাঝি।

পিছনে --- আঁশটে গন্ধ, দাদনের টাকা,
অভাবের হিস্যা, হাঁড়িয়ার হাঁড়ি, ...
সমুদ্র ডেকেছে আজ সব পড়ে থাক।

দ্বিজ
রাজা ভট্টাচার্য্য

এইখানে এসে তিনি নীচু হয়ে দেখে নেন মাটি,
দিগন্তে দিয়েছে পাড়ি ধান কাটা হয়ে যাওয়া মাঠ
দেখে নিয়ে সর্ষে ক্ষেতে মৌমাছির গা((ওড়াউড়ি
রোদে রেখে দেন তিনি কম্পমান কুকুরের ছানা ।

এইখানে এসে তিনি ধান ঝাড়া হয়ে গেলে পরে ।
মৃদু হাতে মুছে দেন চাষাদের হতক্লান্ত ঘাম -
ঠাকুমা মাখাচ্ছে তেল, পাশে এসে উবু হয়ে বসে
কালোকোলো শিশুটাকে কোলে নেন ভীষণ আদরে ।

আড়ামোড়া ভেঙে ঠাণ্ডা জলে নামছে তিনখানা হাঁস,
আড়ামোড়া ভেঙে এই উঠে বসল শীতের সকাল
এইসব দেখে নিয়ে, মেখে নিয়ে সারা গায়ে, চোখে
এইখানে এসে, ফের ঈশ্বরের নবজন্ম হয়।

সেয়ানে সেয়ানে আঁচড়া আঁচড়ি
শুভঙ্কর পাত্র

(১)
ফুলমণি খবরের কাগজ পড়ছে

ফিনফিনে শিলাই নদীর বাঁধ বরাবর
পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে সুদর্শন লাল মোরামের
নতুন রাস্তা হয়েছে।
বয়স্ক শিক্ষার স্কুলে অক্ষর শিখে
মোরামের ওপর চাটাই বিছিয়ে
মোধা বাগদির চোখট্যারা বৌ ফুলমণি
খবরের কাগজ পড়ছে।
পাশ দিয়ে গরু ছাগল রিক্সা সাইকেল ট্রলিভ্যান
চ'লে যাচ্ছে। ধুলোমাখা কালোকালো
হাটুরে লোকজন চ'লে যাচ্ছে।
ফুলমণি মন দিয়ে খবর পড়ছে।

(২)
ফর্সা পাতলা মাধুরী দীক্ষিত

এবার অসম্ভব বউল ধরেছে
ঘন গন্ধে মন ভ'রে যাচ্ছে।
আমের জংলি সবুজ থেকে বেনেবৌয়ের উজ্জ্বল হলুদ
স্লিম ফিগার বসন্তকে যে সোনার আভায়
মাতিয়ে রেখেছে
আর ফর্সা পাতলা মাধুরী দীক্ষিতকে
কাগজের ছবিতে
এক মনে দেখছে ধুমসি নিকষ কেলে ফুলমণি।

(৩)
যুক্তাক্ষর

কীভাবে মেশিনে রোগা হ'তে হয়,
শ্যাম্পুতে চুল ওড়াতে হয়,
সাবানে সাদা হ'তে হয়
--- কাগজের সমস্ত যুক্তাক্ষর
সযত্নে বানান ক'রে ক'রে পড়ে নিচ্ছে
রাজনগর হাটের নবসাক্ষর ফুলমণি মেছুনি।

অচ্ছুত

জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়

আমাদের গ্রাম, দখলে রেখেছি অঞ্চল
থানার পুলিশ ইশারায় চলে, রণবীর
তোরা ছোট জাত, মাথা হেঁট কর, জলদি
জ্বালাব বসত, খাক করে দেব বুড়বক

আমাদের ক্ষেত, আমাদের গম, বাজরা
আমরা ঠাকুর, আমাদের কুয়ো ছুঁবিনা
দুই ক্রোশ দূরে নদী থেকে জল নিয়ে আয়
ভুলে যাস কেন, হায় রাম, তোরা অচ্ছুত

তোদের মেয়েরা টানটান, শুধু, সুন্দর!

তোদের মেয়েরা মাখনের তাল, টাটকা

অস্ত্র

তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিল কারা?
মলিন ঘরের চাল, আসবাব পুড়ে গেল আর
তোমার বোনের লাশ ফুলে উঠছে শালের জঙ্গলে

থমথমে, শুনশান, ধোঁয়া ওঠা গ্রাম
সড়কে উড়ছে ধুলো, ফিরে যাচ্ছে পুলিশের জিপ
কারা এসে ঘিরে ধরে শাসালো আবার!

অস্ত্র তুমি রেখেছ কোথায়?

কানহা-য়
সুপ্রিয় ফণী

এখানে বসতি শেষ, এইখানে জঙ্গলের শুরু,
বাংলোর অদূরে মাঠ, বড় ঘাস, পা-ফেলা নিষেধ —
সেখানে হলুদ-কালো বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে গাঢ(
হাওয়া ঘুরে গেলে প'র, অনুকম্পা মেখে
হরিণের রক্ত আর জ্যোৎস্না এসে মুখোমুখি বসে...

নিষেধের গল্প বলে বুড়ো শাল, চকিত ময়ূর —
হরিণ হরিণ খেলা — মনে পড়ে ঈষৎ আমারও।।

অজ্ঞাতবাস

জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়

মাদল বাজছে দূরে কোন এক আদিবাসী গ্রামে
একফালি চাঁদ জ্বলছে, হারালো মেঘের আড়ালে
নবীন শালের জঙ্গল ঘিরে বাতাসের গান
বালিভা(া বনবাংলোয় একা জেগে আছি আর
দেখছি নীরব অতল স্পর্শী, বোধের শ্রাবণ!

অজ্ঞাতবাস শুরু হল আজ এখানে আমার...

নির্জন

খাড়াই সড়ক, থেমে গেল জিপ, ধকধক...
বনপথ ধরে উঠে এল রোখা রুকস্যাক -
এখানে অঢেল অজানা ফুলের সৌরভ!
বাংলোর নীচে ছিপছিপে নদী, হিলটপ

সারারা(জেগে বসে থাকি, শুনি মর্মর
হঠকারী চাঁদ টোকা মারে, টানে, ফুসলায়
পাতা খসে, পাতা উড়ে যায়, হিম, কুয়াশায়...
আমাদের কথা জানে শুধু একা নির্জন!

দিকভুল
রিপনকান্তি বালা

ভিজে কার্পেট বনভূমি
উড়ন্ত বন্যায় ঢেকে দেয় চাক্ষুস প্রমাণ
যুক্তি তখন কিশোর
অস্পষ্ট শিল্পকে ভর করে
শিশির ধোয়া রোদকে পথ দেখাই --

অভিসার তখন ক্যালেন্ডারে
প্রতিফলনের পর নীলামে ওঠে।

কাছিমের ডিম
খোকন বসু

নদীর চরায় ঘর। জলে প্রতিদিন তার জাফরান ছায়া কাঁপে।
প্রতিদিন গুছিয়ে নিয়ে শুরু করি চরায় নতুন বসবাস
মাটি খুঁড়ে কাছিমের ডিম খুঁজে পেয়ে ভাবি,
আজ খুব ভালো খাওয়া দাওয়া হবে,
আজ তবে পাত পেড়ে খাওয়া দাওয়া, আজ তবে উৎসবের দিন।
মা ঘাটলায় গিয়ে প্রতিদিন বেচে দিয়ে আসে সেই ডিম।
তারপর ভাত হয়, নুনলঙ্কা কোনদিন আছোলা পিঁয়াজ।
বাবা ঘাটের শীতলা মন্দিরে বসে সন্ধ্যার আরতি সাজায়।

প্রতিদিন ভাবি, ভালো খাওয়া হবে একদিন পাত পেড়ে বসে
লাল ডিম নীল ডিম সাদা আট নয় দশ।
প্রতিদিন বালি খুঁড়ে খুঁড়ে ডিম, প্রতিদিন মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ডিম,
প্রতিদিন পৃথিবীর গর্ভ খুঁড়ে ডিম।
মা বলতো, এবার বর্ষায় খুব ঢল হবে, আরও খারাপ দিনকাল,
পৃথিবীর গর্ভে ঢুকে জল সব কিছু নষ্ট করে দিয়ে যাবে।
বাবা ঘাটের মন্দিরে বসে শনিবারের আরতির ঘন্টা বাজায়।

চরাতে আমন নেই, বোরোও নেই, কার পাকা ধানের মই দিতে গেছি কবে?
তাহলে পাড় ভেঙে মাটি খুঁড়ে ডিম খুঁজে এনে কেন পাতে পাই না?
কোন ডিমের গায়ে নীল রঙ তুঁতের দ্রবণ হয়ে ভেসে যায় জলে?
কোড়াল বলে, কোড়ালি গো বোর বড়ো বান, উঁচু করে বাঁধো ভিটে।
স্বপ্নে দেখি সব ডিম ছড়িয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর গর্ভগৃহময়।

প্রতিবেশী
অনিন্দিতা গোস্বামী

আমি ছোট থেকে ভূগোলের হাত ধরে চলি
হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পার হই ম্যাপের সীমানা
কখনও পাহাড়ে হাত গেলে ছুঁয়ে যাই বরফ শীতল
পাঁচ মহাসাগরের জল আর জলজ শ্যাওলা।
বিস্তৃত গমের ক্ষেতে গেলে মনে পড়ে মাআমার ভাজছেন রুটি
গোল গোল সুকান্তের চাঁদ। সামনে জ্বলছে ভিসুভিয়াস
আগুনে ঝল্‌সে যায় চোখ। রোম থেকে ভেসে আসে নিরোর বেহালা।
জ্বলছে বাড়ীর ধারে আগ্নেয় মেখলা, মুগ্ধ ও চোখ
ছুঁয়ে যায় বৃষ্টি অরণ্য আমাজন। ওঙ্গা শিশুর মত
আদিম বালক আমি নাচি ফুটপাতে
কবি নাকি রাষ্ট্রনায়ক !

কবচকুন্ডল গেছে, তবুও দ্বৈরথযুদ্ধে
জ্যোতির্বলয়মধ্যে মৃত্যুহীন সূর্য্যের সন্তান

আলোক পাথর
সমুদ্র গুপ্ত

অতোটা সুন্দর ছিল না তাঁর চেহারা
তবে সুঠাম সুদৃঢ় ছিল কাঠামো
কাঁধ বাহুতে ছিল কৈবর্ত জেলেদের শ্রমের মিশেল
অনার্য নাক , পুরু ওষ্ঠ
স্তুপের মতো ঠেলে ওঠা শিরসন্মুখ
হ্রস্ববাহু কঠিন গোড়ালি খাটো-পাতা পা
এই সরল অতি সাধারণ
স্থানীয় চেহারার ওপরে ছিল
দুরাগত নোনা হাওয়ার স্বাস্থ্য প্রবাহ

জ্ঞানে ও বচনে ছিল
ঐতিহাসিক অন্ধকার বিদূরণের তেজ

আমাদের সন্ধ্যাবাতি ভোরের কিরণ
আলোর অপার উৎস
মৃত্তিকায় অপ্রোথিত আহমদ শরীফ
সুউচ্চ পর্বতের ভার আলোক পাথর।

ওয়ার্কশপ চলছে
বিশ্বনাথ সিংহ

বড়িশা হাই স্কুলের মাঠে
একটি অসমাপ্ত ঘোড়া
মধ্য রাতে ডাক দেয়, সঞ্জয় বারিক,
আজ কত তারিখ?
আজও আমার জন্ম হলো না!

বড়িশা হাই স্কুলের মাঠে মধ্যরাতে
একটি ঘোড়ার টগবগ টগবগ

তারপর রাজপথ ফুটপাত পেরিয়ে
ছুটতে ছুটতে আনোয়ার শা রোড
ধরে লেক গার্ডেন্স,
সেখান থেকে একটি অসমাপ্ত
ঘোড়া ছুটে যায় সোজা গল্ফগ্রীণ
দূরদর্শণের পর্দায় লাফ দিয়ে পড়ে।

ঘরে ঘরে শোনা যায় তার হ্রেষাধবনি
সঞ্জয় বারিক
আজ কত তারিখ?
আজও আমার জন্ম হলো না!

কর্ণ

প্রতিমা ঘোষ

দ্বৈরথ যুদ্ধের কথা মনে ছিল, তবু, -
তীব্র কোন অহঙ্কারে কতযুগ আগে
হেলায় দিয়েছি খুলে কবচকুণ্ডল
প্রবঞ্চক দেবতার প্রসারিত হাতে।

এক বিঘাতিনী শক্তি, সেও চলে গেছে -
তবু কি সহজে বধ্য ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে আমি?
ভগ্নরথ কর্দমপ্রোথিত হোল দুর্ভাগ্যের মতো -
কোন রুদ্র অভিশাপে বিস্মরণ হয়ে গেছে
সূতীক্ষ্ম সহস্র শর এই মূহূর্ত্তেই।

তোমার দুচোখ জ্বলে জিঘাংসা প্রখর -
দ্বৈরথ যুদ্ধের শেষে, জেনো কৃষ্ণ
তোমার নির্মম চোখে চোখ রেখে
কয়েক মুহূর্ত্ত শুধু চেয়েছিলো ভাগ্যহত
কুন্তীর প্রচ্ছন্নজাত প্রথম সন্তান।

ভেঙে গড়ে গৈরিকস্রাবী উচ্চ গিরিচূড়া।
সূর্য্যদেব, পিতা, মৃত্যুর মূহূর্ত্তে দেখি
তোমার নিষ্প্রভ ক্লান্ত অস্তমিত মুখ,
কবচকুন্ডল গেছে, তবুও দ্বৈরথযুদ্ধে
জ্যোতির্বলয়মধ্যে মৃত্যুহীন সূর্য্যের সন্তান।

কণিষ্ক

প্রতিমা ঘোষ

তবু কি কোথাও কেউ জেগেছিল ?
কোন ক্ষীণ রশ্মিরেখা
          একপলকে ঝলকে উঠেছিল ?
বিকলাঙ্গ বৃহৎ বিবেক একা
নিশ্চল নিষেধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তবু
          কাটামুণ্ড কণিষ্কের মতো ?
কুঠার, শাবল, কাস্তে, হাতুড়ির ঘায়ে
রক্তাক্ত মানুষ এক শবদেহ হয়ে শুয়েছিল।
রক্তবিন্দু, ক্লেদ মেখে উন্মত্ত প্রেতের মতো
          শ্মশানের মাটিতে যারা নৃত্য করেছিল
          তারা কি মহান ব্রতধারী ?
ভেঙে যায় কতো মাথা কুঠারের অমোঘ আঘাতে
খলখল হেসে ওঠে শ্মশান প্রেতের দল -
অন্ধকারে চিতা জ্বলে অলজ্জ উল্লাসে -
স্কন্ধহীন কণিষ্ক মূর্তি কিছুই দেখে না।

আমিই চার্বাক
গৌতম মুখোপাধ্যায়

আমি চার্বাক
বার্তা পাঠাই প্রতিফলিত আলোর পথ ধরে,
বহু লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে, বৃদ্ধ আদমের কাছে
বিষ বৃক্ষের ঘন অরণ্যে পড়ে আছে সাপের কঙ্কাল,
ঝরনার জলে ইভের নিরাবরণ দেহ, প্রদর্শিত বিজ্ঞাপন—
প্রতিবাদী থিম, আমার ক্যানভাসে।

আমি উদাসীন
তুমি কম্পিত, শকুনেরা জড়ো হয় মেঘের ছায়ায়;
সূর্যের আলোর রেখায় বিচ্যুতি, স্তব্ধ উত্তরায়ণ,
কুরুক্ষেত্রে শায়িত পিতামহ, ইচ্ছামৃত্যুর বাতিল প্রদর্শন—
আমি চার্বাক, ঘোষিত যুদ্ধ আমার ক্যানভাসে।

ব্রহ্মাস্ত্রের পালকে মাখাই রঙ,
বহু লক্ষ মৃত্যুর নির্বাক প্রদর্শন, দেখাও বিশ্বরূপ,
বার্তা পাঠাই বহু আলোকবর্ষ দূরে,
রামধনুর ছিলা টানটান, ঊর্ধ্বমুখী;
বিষবৃক্ষের কাঠে সজ্জিত চিতা, শেষ অধ্যায়—
আমার ক্যানভাসে নগ্ন ভগবান, শেষ শয্যায়।

ঘুঘুর ভিটে
গৌতম মুখোপাধ্যায়

এখানে পৃথিবী এখনো অসমান
এখানে জন্মলগ্ন আজও গোত্রহীন।
এখানে ভিটেতে ঘুঘুর কোলাহল
এখানে ল্যাম্পপোস্ট, প্রতীক্ষার দিন।

এখনো কুরুক্ষেত্র আবৃত এখানে
এখনো ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ — এখানে,
এখনো কুরুপিতা দেখেনি দিনের আলো
এখনো আর্জুনীর মৃত্যু এখানে।

এখানে ঝড়ের এককে এক দীর্ঘশ্বাস
এখানে সাগর শুধু অশান্ত বিক্ষোভ,
এখানে গাণ্ডীব, ছিলা ছেঁড়া অক্ষম
এখানে পাঞ্চজন্য গান্ধারীর রোদন।

এখনো কৌরবী বিধবা এখানে
এখনো লাঙলে ওঠে কৌরবের হাড়,
এখনো যুদ্ধ জেতেনি পান্ডব
এখনো চক্রব্যূহ রচিত এখানে।

এখনো রাজা আসে, এখনো রাজা যায়
চোখেতে বাঁধা থাকে এখনো কাপড়,
এখনো প্রতিবাদী এখানে যৌবন
এখনো মোড়ে মোড়ে শহীদের বেদী।

এখানে ট্রেনে বাসে এখানে ফুটপাতে
এখানে পিতামহ এখনো শরাহত,
এখানে পাশার চালে শকুনি এখনো
এখানে পার্থ আজ সারথি বিহীন।
এখানে বলরাম এখনো ধরে হাল
এখানে যদুকুল এখনো উদ্ধত,
এখানে দ্রৌপদী আজও বস্ত্রহীন
এখনো রথের চাকা মাটিতে প্রোথিত ।।

বিন্দুতে বিন্দুতে প্রেম জমা হয় নদীর দু'পাড়ে,
ফসল ফলায় প্রেম, বেঁচে থাকে মানব সভ্যতা

নদীমাতৃক

রাতুল চন্দ্ররায়

আদম - ইভের গল্প কম - বেশি সক্কলেই জানে।
কথিত আছে যে ওরা মজেছিল জ্ঞানবৃক্ষ - ফলে;
গুজব; আসলে ওরা নদীতীরে ঘর বেঁধেছিল,
নদী ও চাঁদের কাছে শিখেছিল, ‘প্রেম’ কাকে বলে!

তখন থেকেই প্রেম মানুষের ইতিহাস লেখে।
প্রস্তর যুগের চাঁদ, একুশেও জীবন্ত কবিতা!
বিন্দুতে বিন্দুতে প্রেম জমা হয় নদীর দু’পাড়ে,
ফসল ফলায় প্রেম, বেঁচে থাকে মানব সভ্যতা।

তারা

প্রমোদ বসু

মুখে মুখে কত মিথ্যে রটনা,
ছেয়ে গেল কত নিন্দে।
কথা ঘুরে যায় রাজপথ, গলি,
কথা সার সার অলিন্দে।

তবু, তারা যায় নীল বন ঘুরে
দূরে দূরে কত দিগন্তে। ---
সারাদিন, তারা সূর্য - দোসর,
চাঁদ নিয়ে খেলে দিনান্তে।

শহরে শহরে কটুনাম ছোটে,
গ্রামে গ্রামে ঘোরে জল্পনা।
তবু যুগলের সামনে কবিতা,
বন্ধুর নাম কল্পনা।

ব্যক্তিগত রূপকথা
সৌমিত্র বসু

হাওড়ায় বাস এলে মনে পড়ে তার সাথে এইখানে দেখা হবে আজ।
রোদের গভীর থেকে প্রবল ছায়ার মতো যেন জেগে উঠবে শরীর।
মাস্টারি ছুঁড়ে ফেলে দুইজনে চলে যাব ফাঁকা ট্রেনে বেপথু লাইনে
মাঝপথে বুনো বাস চকিত স্টেশনে নেমে পার হব বিকেলের মাঠ
ঘামতেল অন্ধকারে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে তুলোধোনা ফাটাবো
জ্যোৎস্নাকে
মধ্যরাতে ঘরে ফেরা মাতাল ঘুড়ির মতো চম্‌কাবে মা ও পুলিশ।

কফি হাউস
রিপনকান্তি বালা

মেয়েটি নির্বাক শ্রোতা বুঝি
আহা, এখন একটা দৃশ্যের জন্য
পূর্ণজন্মও খেয়ে নিতে রাজি আছি ---

উহাদের টেবিলে চাউমিন
উষ্ণতার গন্ধ ছড়ায়...
পড়ে থাকে ফল্‌স পেটে একা
শোয়ানো দুইটি চামচ
বড় কাছাকাছি ---

এবুকে আকাশ রেখেছিলাম

পিঠ জুড়ে চিহ্ন সংকেত
একাকিত্বের সঙ্গে বিরামহীন দীর্ঘশ্বাসে
পতন - অনুরনণ একই সাথেই বাজে
আর বাজতে ...বাজতে
এক -একটা স্বপ্ন ভারী কালো মেঘ ---
ফি-বছর ধরে বর্ষাকাল

পাখিরে কোটর থেকে মুখ বের করে
কি দেখছিস ?
সমস্ত রোদ ভিজে গেছে...

সুব্রতদা আর আমি
সুজিত সরকার

যেন দুটি কৃষ্ণচূড়া গাছ

কাছাকাছি
পাশাপাশি

বড়ো হ'তে হ'তে
আমাদের ডালপালা
মিলেমিশে গেছে

দূর থেকে ঠিক যেন একটিই গাছ

টের পায়না কেউ
আমাদের যত কথা
শিকড়ে শিকড়ে

বৃষ্টিওলা
জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়

আমাকে ডেকেছো তুমি, অকপট, যাবো ---
লালমাটি, শালবন, দাউ দাউ জ্বলছে পলাশ!
খসা পাতা ধুলো মেখে উড়ে যাচ্ছে অসীমের দিকে

শুকনো কুয়োর পাশে ম্লান মুখে বসে আছো একা
তোমার নিকোনো ঘর পুড়ে যাচ্ছে রোদের লাভায়

আমি ঝড়, আমি মেঘ, ভেঙে পড়বো তোমার জীবনে!

প্রেম

অশোক মহান্তি

আজ তোমার সঙ্গে ঝগড়া।
গতকালও তোমার সঙ্গে ঝগড়া ছিলো।
আগামী কাল?
যতদূর মনে হচ্ছে, আগামীকালও তোমার সঙ্গে ঝগড়া থেকে যাবে।

আগামীকাল দোল
আমি যদি পাশের বাড়ির বৌটির সঙ্গে হোলি খেলি ---
আমি জানি, রাত্তিরেও তুমি আমাকে তোমার পাশে ঘুমুতে দেবেনা।

না দিলে,---নাই বা দিলে!
কিন্তু জানি, ঝগড়া করতে এসে তুমি কথা বলবে।
ভীষণ শাসন করবে।
তারপর
অনেক রাত্তিরে চাঁদ ডুবে গেলে---
চুপি-চুপি মশারির পাশে এসে - দেখে যাবে
মশারিতে ফুটো আছে কিনা!

শয়নেষু রম্ভা
সুতপা সেনগুপ্ত

মুখটা কুচ্ছিৎ, শুকনো কাঁকলাস শরীর বরের পাশে মনে হয় যেন, হি হি — ঝি
উঠে দৌড়ে কাজ করে, বরের স্নানের জল সেই একতলা থেকে টেনে তোলে রোগা হাত, ভঙ্গুর কোমর
পিঠের হাড়দুটো উঁচকো কণ্ঠা যেন তেল-মাপার কুপি
পর্দা তুলে বর তো রোজই ইতিউতি এ বাড়ি সে বাড়ি
রোববার বরের ছুটি, সকালবেলা বউটার কী সাজ কী সাজ
দেখে, আয়নারও মায়া লাগে

সৈনিকের বউ

জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়

সৈনিকের বউ শান্ত, কাঁদেনা কখনো
মরদ সীমান্তে গেছে, সামলায় ঘর
কত কাজ দিনভর! আক্ষেপ করেনা
কোলের শিশুটি ছোট, মা'র কাছে খায়

গ্রামের মুখিয়া শোনে বিবিধ ভারতী
মাঝেমধ্যে বুলেটিন, ফ্রন্টের খবর
ডাকপিওনের চিঠি, মাসে একবার
সোনালী গমের খেতে সূর্য ঢলে যায়...

একদিন ট্রাক আসে, কফিনের হিম
পাড়ার সক্কলে ছোটে, শব্দ নেই কোনো!
হলুদ পাতার ঝড়, দীর্ঘ বিউগল
সৈনিকের বোবা বউ কাঁদেনি তখনো!

অমাবস্যার আলো

আশিষ চক্রবর্তী

পীচ রাস্তার ভাঙ্গা কালভার্টে
শুয়ে একা,
আকাশমণি গাছের ফাঁক দিয়ে
দেখি, কালো আকাশের বুকে
অজস্র সব তারা।
মনে পড়ে যায়, সেই কবে
কালো শিফনের শাড়ীতে
রুপালী চুমকী
জড়ানো ছিল, তোমার গায়ে।
আজ আমাবস্যার রাতে
ঠিক যেন তুমি,
আকাশ হয়ে ডাকছো
আমাকে।
প্রেমিকরা সব-
জ্যোৎস্নার কথা বলে,
ভরা চাঁদের আলোয়
হাত ধরে হাঁটে;
আদম আর ইভ।
ওরা অন্ধ-
তাই আলোর খোঁজে ফেরে,
আমি তো এই কুচকুচে
কালোর চাদরে জড়ানো -
কত অজস্র তারা দেখি,
আর মাটির উপর
জোনাকিরা, সবুজ আলোয়
আমার পথ দেখায়।
আমি হেঁটে চলি
অন্ধকারের হাত ধরে
তোমার কাছে।

অর্ধেক
জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়

যে কথা বিনিকে বলি, বলিনা তোমাকে
যে কথা তোমাকে বলি, বিনিকে বলি না
বিনি তো অর্ধেক জানে, তুমিও অর্ধেক...
তোমাদের ভ্রম দেখে ফুর্তি হয় আর
দু পেগ ভদকা মেরে ব্যাপক ঘুমাই!

স্বপ্নে আধখানা দেখি তোমাকে, বিনিকে...

বিজ্ঞাপনের মেয়ে
গৌতম মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপনের মেয়ে বলো কাটলো কেমন আজ,
বলো তোমার ব্যক্তিগত সন্ধে থেকে ভোর
বলো তোমার টিভি চ্যানেল, ফ্যাশান প্যারেড বলো
বলো তোমার চুল থেকে নখ নিয়ন বাতির নিচে
রঙিন করে রেখেছিল এসপ্ল্যানেডের মোড়।

বিজ্ঞাপনের মেয়ে, তোমার হারিয়ে যাওয়া গ্রাম
বলো তোমার মোড়লপাড়ার চৈত্র মাসের মেলা
বলো তোমার নিঝুম দুপুর কাজলা দিঘির পার
বলো তোমর স্কুলের পথে লুকিয়ে দেখা করা
বলো তোমার অলস বিকেল পুতুল নিয়ে খেলা।

বিজ্ঞাপনের মেয়ে তোমার জীবন তোমার ইহজীবন
বলো কেমন বিকিয়ে গেছে বিকিকিনির হাটে
বলো কেমন শ্রাবণ-দুপুর জানলা খোলা রবিঠাকুর
বলো কেমন প্রথম প্রেম আর প্রথম ডুরে শাড়ি
বলো এসব কেমন হারিয়ে গেল সাত মহলা ফ্ল্যাটে।

বিজ্ঞাপনের মেয়ে তোমায় ভালোবাসতে পারি
যদি উদোম গায়ে জড়াতে পারো ডুরে রঙিন শাড়ি।

যে ছেলেটি সদ্য সিগারেট খেতে শিখেছে

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

মেয়েরা, যে কথাটি কখনো প্রথমে বলে না
ঠিক সেই কথাটির জন্যই
সারাটা বিকাল নষ্ট করে
হলুদ জামা - নীল জামা,
ডেনিম জিন্স
আর্দ্র বেগুনী বাতাসে একসময় মিলিয়ে যায়...

খোলা চোখে দেখলে এটাই দুঃস্বপ্ন মনে হয়,
আস্তে আস্তে একটি হিলহিলে চেহারার সিরিয়াল
ক্রমশঃ দখল করে মন ---

এত কলেজ ফাঁকি, এত চিঠি পত্র,
এত অপেক্ষার পরও বুঝলে না ---
মেয়েরা আসলে সিগারেটের বিজ্ঞাপন,
ঐ কথাটি কখনোই সহজে বলে না...

তোমার প্রেমিক
জয়ন্তজয় চট্টোপাধ্যায়

যে তোমার প্রেমে অন্ধ, শোকে মুহ্যমান
কাল তাকে গড়িয়াহাটায় দেখলাম --
তোমার সমস্ত কথা সে জানতে চায়

তার মুখে আলো পড়ে শেষবেলাকার
চা খাই দুজনে, তাকে ঈর্ষা করি, হায়
ঝমঝম মুছে গেল বেহালার ট্রাম

আশালতা

বহুদিন পরে দেখা একডালিয়ায়
আশাকরি ভালো আছো আশালতা রায় ?
এ জগৎ মন্দ তাই ভালো থাকা দায় ---
বিষাদ তোমার চোখে, আমি নিরুপায়

তুমি ভালো নেই দেখে মন ভরে যায় !